সমর দর্শন

আ ল ম ফজলুর রহমান

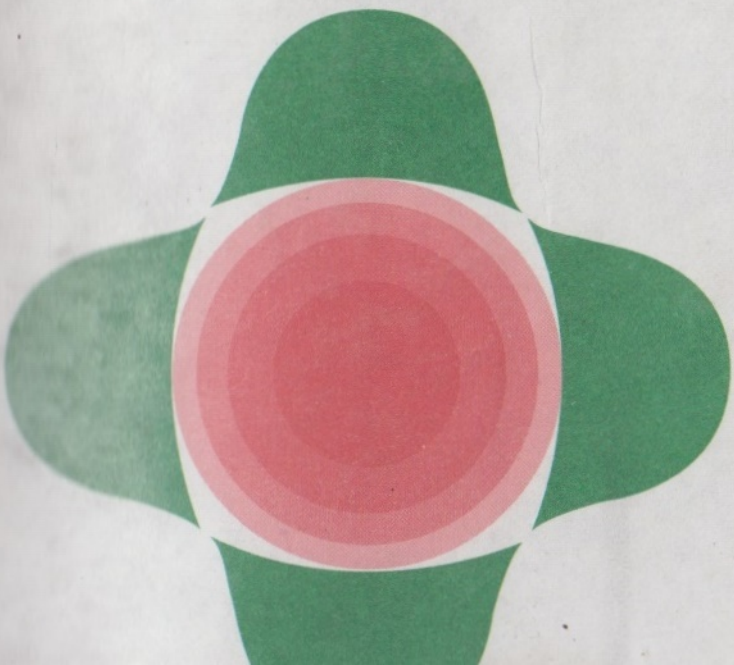

বাঙালি জাতির অনালোচিত উজ্জ্বল সামরিক ঐতিহ্য আজ বিস্মৃতপ্রায়। বর্তমান গ্রন্থে লেখক বিস্মৃতপ্রায় এ দিকটিকে আলোকিত করেছেন।

বই-এ সমর দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য 'আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা'--এই মর্মবাণীকে সামনে রেখে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের জন্য জাতীয় সার্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডগত নিরাপত্তা বিধান, সামরিক, রাজনৈতিক ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ এবং সেই সাথে দেশের জন্য স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ কার্যকরী সশস্ত্র বাহিনী গঠন, মানানসই রণনীতি ও রণকৌশল প্রণয়নে একটি যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত ধারণা দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে--যা বাস্তবায়িত হবে দেশের সমরনায়ক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন নাগরিকদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে একটি ঐকমত্যের বেদীতে অবস্থান গ্রহণের মধ্য দিয়ে। লেখক তাঁর 'সমর দর্শন' বইতে বাঙালি জাতির সমর নীতির অতীত ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিক নির্দেশনায় স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন--এমন দাবি অযৌক্তিক নয়।

www.pathagar.com

মেজর জেনারেল আ.ল.ম. ফজলুর রহমান, এনডিসি, পিএসসি ১৯৫১ সালে দিনাজপুর জেলার সদর কোতয়ালী থানার পূর্ব-মোহনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্নাতক শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে 'কাটলা মুক্তিফোজ এন্ড ইউথ রিসেপশন ক্যাম্প' এর নেতৃত্ব দেন এবং প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশ ওয়ার কোর্স-২ এর শিক্ষানবিস ক্যাডেট হিসেবে তিনি ভারতস্থ মুরতি একাডেমীতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় দেশ শত্রুমুক্ত হলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাটল স্কুলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে ১৯৭২ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পদাতিক কোরে কমিশন লাভ করেন। তিনি ঢাকার মিরপুরস্থ ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি, গণচীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জয়েন্ট অপারেশনে ডিপ্লোমা, পাকিস্তানের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ হতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং কায়েদে আযম আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিফেন্স এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিতে 'মাস্টার অব সায়েন্স' ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্তমানে তিনি এলপিআর-এ আছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যাসন্তানের জনক।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সমর দর্শন

মেজর জেনারেল আ. ল. ম. ফজলুর রহমান
এনডিসি, পিএসসি

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

বাএ ৪২৭৬

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪০৬/ ফেব্রুয়ারি ২০০০। পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান : সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশক : পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪০৯/জুন ২০০২। প্রকাশক : ফজলুর রহিম, উপপরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক উপবিভাগ [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প], বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : মোঃ হামিদুর রহমান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ : আবদুর রোউফ সরকার। মুদ্রণসংখ্যা : ১২৫০ কপি। মূল্য : ৬০.০০ টাকা মাত্র।

SAMAR DARSHAN (War Philosophy) by Major General A. L. M. Fazlur Rahman. ndc. psc. Published by Bangla Academy Dhaka-1000, Bangladesh. First Reprint : June 2002. Price : Taka 60.00 only.

ISBN 984-07-4285-X

www.pathagar.com

উৎসর্গ

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গকারী লাখো শহীদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

সমর দর্শন যুদ্ধের মর্মবাণী। যুদ্ধকে অনুধাবন করতে হলে এ বাণীকে উপলব্ধি করা অপরিহার্য। যুদ্ধের মতো জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে সকল চিন্তাশীল নাগরিকের অবহিত হওয়া দরকার। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই দাবি আজকে আরো জোরালো হয়েছে। কারণ যুদ্ধ এখন আর সমরবিদদের একক বিষয় নয়। প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্পূরক বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হওয়ার ফলে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি রাষ্ট্র পরিচালনার মূল পরিকল্পনাসমূহের অতল স্পর্শ করেছে। অতএব "আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা" সমর দর্শনের এই মূল প্রতিপাদ্য রাষ্ট্রের জাতীয় ও ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্বের ধারণার সাথে একাকার হয়ে গেছে। ফলে, দেশ রক্ষার মহান ব্রত পালনে দেশের সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের ভূমিকাকে বর্তমানে আলাদাভাবে দেখবার অবকাশ নেই।

বর্তমান গ্রন্থে সমর দর্শনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে একটি যৌক্তিক ধারণা দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য বাস্তবসম্মত প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়নে, সমর নীতি ও রণকৌশল নির্বাচন এবং রাজনৈতিক ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে দিক নির্দেশনা প্রদান বোধকরি সহজতর হবে।

বইতে সন্নিবেশিত অধ্যায়সমূহে প্রবাহিত সামরিক চিন্তার ধারাবাহিকতা এবং আরো কিছু নতুন রচনা যুক্ত করে এই চিন্তাকে সমন্বিত রূপদান ও পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য লেঃ কর্নেল আকরাম আলী, পিএইচ.ডি, এইসি, মেজর মোঃ আনিসুর রহমান চৌধুরী, এইসি ও জনাব শাহীনুল ইসলাম আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন। আমি অনুজপ্রতিম এই তিনজনের ঐকান্তিকতাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি। এ ছাড়া এ কাজের অন্তহীন প্রেরণা ছিলেন আমার স্ত্রী বেগম এন্‌জেলা রহমান।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ এবং বইটি দ্রুত মুদ্রণে পাঠ্যপুস্তক বিভাগের পরিচালক জনাব গোলাম মঈনউদ্দিন ও ড. সুকুমার বিশ্বাস যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করায় তাঁদেরকে ধন্যবাদ।

এই ক্ষুদ্র প্রয়াস পাঠক মহলে আবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ হলে আমার মতো অনেকের স্বপ্নই আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে বলে মনে করবো।

ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০

মেজর জেনারেল আ. ল. ম. ফজলুর রহমান
এনডিসি, পিএসসি

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় :	সমর দর্শন	১১
	যুদ্ধের উদ্দেশ্য	১১
	যুদ্ধ ও রাজনীতি	১১
	যুদ্ধের মৌলিক রূপ	১২
	যুদ্ধের নিয়ম (Law of War)	১৫
	যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ম (Law of Directing War)	১৬
দ্বিতীয় অধ্যায় :	বাঙালির সামরিক অতীত	২৫
	সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন বাংলা	২৫
	সামরিক পদবি ও সেনাবিন্যাস	২৮
	সুলতানি আমলে বাংলা (সামরিক সংগঠন, রণকৌশল, সেনাবিন্যাস ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা)	২৯
তৃতীয় অধ্যায় :	বাংলাদেশের সামরিক সম্ভাবনা	৩৪
	সামরিক সম্ভাবনার বিবেচ্য বিষয়	৩৫
	ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান	৩৫
	ভূ-প্রকৃতি	৩৫
	প্রাকৃতিক পরিবেশ	৩৬
	জাতিগত সমরূপতা	৩৬
	রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক চেতনা	৩৭
	ধর্মীয় বিশ্বাস	৩৮
চতুর্থ অধ্যায় :	সামরিক সম্ভাবনার আলোকে ২০০০ সাল	৪০
	অতীত চর্চা	৪২
	অতীতের আলোকে সামরিক সূত্র নিরূপণ	৪৪
	২০০০ সালে সামরিক লক্ষ্যমাত্রা	৪৬
পঞ্চম অধ্যায় :	ভূ-রাজনীতির নিরিখে যুদ্ধের সম্ভাব্য প্রবণতা বিশ্লেষণ ও যুদ্ধকৌশল নির্ধারণ	৪৯
	যুদ্ধ প্রবণতা বিশ্লেষণ	৫০
	ভৌগোলিক অবস্থান	৫০
	সম্পদ	৫১
	সুবিধা প্রদান	৫১
	পানি সম্পদের ব্যবহার	৫২
	জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মীয় স্বার্থ সংরক্ষণ	৫৩
	পুনঃএকত্রিকরণ	৫৩
	যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণ	৫৪

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় :	একটি সামরিক পরিকল্পনার সন্ধানে	৫৬
	সামরিক শিক্ষা	৫৬
	ভূ-রাজনৈতিক বিষয় ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা	৫৭
	অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামরিক শক্তি	৫৯
	জাতীয় নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনী	৬০
সপ্তম অধ্যায় :	একটি রণকৌশলের সন্ধানে	৬২
	রণকৌশল নির্ধারণ	৬৩
	রণকৌশল নির্বাচন	৬৩
	কৌশলগত সীমাবদ্ধতা (ভূখণ্ডিক গভীরতা, যুদ্ধের সম্প্রসারণ ও পর্যায়)	৬৪
অষ্টম অধ্যায় :	রণকৌশলগত সমস্যা সমাধান : একটি পর্যালোচনা	৬৭
	রণকৌশল কি	৬৭
	রণকৌশল আত্মস্থকরণ	৬৮
	প্রশিক্ষণের ধারা	৬৯
	প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা	৬৯
	রণকৌশলের পরিধি	৭১
	সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা	৭৩
নবম অধ্যায় :	যুদ্ধ জয়ের জন্য কি বৃহৎ বাহিনী অপরিহার্য?	৭৬
	বড় বাহিনী কি যুদ্ধ জয়ের জন্য নিয়ামক?	৭৬
	শক্তি এবং বিরাটত্ব কি সম্পূরক?	৭৭
	অসম যুদ্ধের শেষ ফল কি অবধারিত?	৭৮
	রণবিজয়ী কাঙ্ক্ষিত বাহিনীর ধারণা	৭৯
দশম অধ্যায় :	প্রেক্ষাপট : উপসাগরীয় যুদ্ধ	৮১
	যুদ্ধের কারণ : একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলাফল	৮১
	জয়-পরাজয়	৮৬
স্কেচ্ :	যুদ্ধাবস্থায় প্রতিরক্ষা অবস্থান হতে পাল্টা আক্রমণ	১৭
	যুদ্ধাবস্থায় শত্রুকে চলমান যুদ্ধে ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ব-স্থিরিকরণ	১৯
	যুদ্ধাবস্থায় পূর্বে আক্রমণের ভান, পশ্চিমে আক্রমণ	২১
	সমর দর্শনের ক্রমধারা	২৩

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

সমর দর্শন

কোনো বিষয়ের মর্মবাণীই হচ্ছে তার দর্শন। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যেমন মর্মবাণী থাকে তেমনি যুদ্ধের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও মর্মবাণী বা দর্শন আছে, যার অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য প্রবন্ধে এই দর্শনকে সহজলভ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে এ ব্যাপারে একটি সর্বজনীন আবেদনের সৃষ্টি হয় এবং এ সম্বন্ধে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সঠিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যুদ্ধকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর মাঝে গতিশীল বিপরীতমুখী নিয়মসমূহকে আত্মস্থ করে ঐ নিয়মগুলোর দ্বারা যুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয় লাভ করতে পারা যায়।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য

যুদ্ধের উদ্দেশ্য 'নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা'। প্রাচীন যুদ্ধে ব্যবহৃত হতো বর্শা আর ঢাল। বর্শা আক্রমণ করার জন্য, শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য, আর ঢাল প্রতিরক্ষার জন্য, নিজেকে রক্ষা করার জন্য। আজকের সমর অস্ত্রও এই দুটোরই পরিবর্ধিত রূপ। বোমারু, মেশিন গান, দূর-পাল্লার কামান এবং বিষাক্ত গ্যাস হচ্ছে বর্শার উন্নত রূপ। বিমান আক্রমণ বিরোধী আশ্রয়স্থল, লৌহশিরস্ত্রাণ, কংক্রিট নির্মিত দুর্গাদি ও গ্যাস নিরোধক মুখোশ হচ্ছে ঢালের উন্নত রূপ। কেবল বিপুল পরিমাণে শত্রুকে ধ্বংস করেই নিজকে কার্যকরীভাবে রক্ষা করা যায়। অতএব, 'নিজকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা' যুদ্ধের এই উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যুদ্ধের দর্শনগত সারমর্ম।

যুদ্ধ ও রাজনীতি

ক. যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ। এই অর্থে যুদ্ধই রাজনীতি এবং যুদ্ধ নিজেই রাজনৈতিক প্রকৃতির কার্যকলাপ। কিন্তু এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে এবং এ অর্থে যুদ্ধ সাধারণ রাজনীতির সমান নয়। যুদ্ধ অন্য উপায়ে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ। রাজনীতি যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিকাশ লাভ করে আর এগুতে পারে না তখন যুদ্ধ বাধে রাজনৈতিক পথের বাধাকে দূর করার জন্য। অতএব, একথা বলা যেতে পারে যে, রাজনীতি রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হলো

www.pathagar.com

রক্তপাতময় রাজনীতি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধ বাধে এবং তা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত শেষ হয় না। আর এই উদ্দেশ্য যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবহমান থাকে। প্রাচীন কাল হতে আজ পর্যন্ত এমন কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি যার রাজনৈতিক চরিত্র ছিলো না।

খ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। রাজনীতি 'যুদ্ধ ও রাজনীতি'র সম্পর্কের প্রধান নিয়ামক। এক্ষেত্রে রাজনীতি মস্তিষ্ক এবং যুদ্ধ তার আধার। সুতরাং যুদ্ধের উপর রাজনীতির প্রভাব ব্যাপক এবং তা যুদ্ধের ক্রমোন্নতি এবং ফলাফল নির্ধারিত করে। যে যুদ্ধ অন্যের দেশে জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ, শোষণ এবং ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় তা 'অন্যায় যুদ্ধ'। অন্যদিকে, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সংঘটিত যুদ্ধ হচ্ছে 'ন্যায় যুদ্ধ'। যেহেতু ন্যায় যুদ্ধে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও শান্তির প্রতি তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে তাই তা জনতার সমর্থন পায়, ফলে এতে জয়লাভ নিশ্চিত। অপর দিকে অন্যায় যুদ্ধ জনগণের ইচ্ছা ও শান্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং ধ্বংস ও দুর্দশা বয়ে আনে। তাই তা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হতে বাধ্য। ইতিহাসে শুধু দু'ধরনের যুদ্ধ রয়েছে, ন্যায় যুদ্ধ আর অন্যায় যুদ্ধ।

গ. রাজনীতি যুদ্ধের উপরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যদিও যুদ্ধ সরাসরি রাজনীতির মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু সব সময় তা রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। পক্ষান্তরে, যুদ্ধও রাজনীতির উপরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রথমত, যুদ্ধের 'জয় পরাজয়' রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সরাসরি জড়িত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অনেকভাবে অর্জন করা সম্ভব। আর যখন সেটা সাধারণ পন্থায় অর্জিত না হয় তখন যুদ্ধের মাধ্যমেই তা লাভ করতে হয়। যখন যুদ্ধ বাধে তখন রাষ্ট্র ও জাতির যাবতীয় প্রচেষ্টা যুদ্ধ জয়ের নিমিত্তে পরিচালিত করতে পারলেই বিজয় অর্জন করা যায়। আর কেবল যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ শুরু হলে তা তার অন্তর্নিহিত বিধি দ্বারা অবশ্যই পরিচালিত করতে হবে। আর তা না করলে পরাজয় নিশ্চিত, ফলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন কষ্টসাধ্য হয়।

যুদ্ধের মৌলিক রূপ

ক. যে কোনো সমর অভিযানে দু'টি পর্যায় থাকে, আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক এবং দীর্ঘকাল ধরে এগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ, আর শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হলো প্রথম পর্যায়। আক্রমণের বিরুদ্ধে শত্রুর প্রতিরক্ষা আর শত্রুর প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে আক্রমণ, এটা দ্বিতীয় পর্যায়। এ দুই পর্যায় হচ্ছে প্রত্যেক সমর অভিযানের মধ্যে লড়াইয়ের রূপের পুনরাবৃত্তি।

www.pathagar.com

খ. যুদ্ধের অন্যান্য প্রকৃতিসমূহ এই দুই মৌলিক রূপের বিকাশজনিত ধারাবাহিকতায় প্রয়োজনে অনুসৃত হয়। যেমন পশ্চাদপসারণ, প্রতিরক্ষার সীমারেখার মধ্যে প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক রূপ এবং পশ্চাদ্ধাবন আক্রমণের মধ্যে আক্রমণের ধারাবাহিক রূপ।

গ. প্রকৃতির দিক দিয়ে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা বিপরীতধর্মী হলেও উভয় উভয়ের সম্পূরক এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের একক প্রকৃতিতে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা সমভাবে বিদ্যমান। আক্রমণ ছাড়া প্রতিরক্ষা হয় না এবং প্রতিরক্ষা ছাড়া আক্রমণ নয়। শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন প্রতিরক্ষা। আবার আক্রমণ পরিচালিত হয় যখন শত্রু প্রতিরক্ষায় থাকে। যুদ্ধাবস্থার ক্রমধারায় এই উভয় রীতি অবিভাজ্যভাবে অস্তিত্বশীল। তবে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা একে অপরের মধ্যে প্রতিভেদ করে। যেমন প্রতিরক্ষার মধ্যে আক্রমণ এবং আক্রমণের মধ্যে প্রতিরক্ষা। বিশেষ অবস্থায় আক্রমণকারী এবং প্রতিরক্ষাকারী, আক্রমণ হতে প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষা হতে আক্রমণে পরিবর্তন করে। আর এভাবেই আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা পরস্পরের বিপরীতমুখী হয়েও একে অপরের মধ্যে সমন্বিত হয়। আর এসব হলো যুদ্ধের মৌলিক রূপ। নিম্নে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো :

১. প্রতিরক্ষা

ক. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্যেক যুদ্ধের দু'টি মৌলিক রূপ রয়েছে, "আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা"। যেমন আক্রমণ করার জন্য প্রতিরক্ষা গ্রহণ করা। আবার প্রতিরক্ষার জন্য আক্রমণ।

খ. ধরা যাক, কৌশলগত দিক থেকে শত্রু বাহিনী শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে, যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে তাকে দুর্বল করতে হবে এবং একই সময় নিজের দুর্বল অবস্থাকে দৃঢ় অবস্থায় রূপান্তরিত করে নিতে হবে। এগুলোকে বলা হয় প্রতিরক্ষার মধ্যে আক্রমণ। এক্ষেত্রে জয়লাভ নির্ভর করে মূলত সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার উপরে। এখানে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে নিজের শক্তিকে সংরক্ষণ, এবং শত্রুকে ধ্বংস করার পদ্ধতি নির্ধারণ। অতএব, সামরিক কার্যকলাপে প্রতিরক্ষাই হলো সবচেয়ে জটিল ও কঠিন সমস্যা।

২. পাল্টা আক্রমণ

ক. পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের সবচেয়ে প্রাণবন্ত এবং শেষ পর্যায়। সক্রিয় প্রতিরক্ষা বলতে মুখ্যত পাল্টা আক্রমণেরই উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

খ. পাল্টা আক্রমণ প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের মধ্যবর্তী একটা উত্তরণ পর্যায় এবং চরিত্রের দিক থেকে আক্রমণের প্রাক্কাল।

৩. **আক্রমণ**

ক. সমস্ত সামরিক কার্যকলাপের পরিচালনা নীতিই এসেছে একটি মৌলিক নীতি থেকে অর্থাৎ 'যথাসম্ভব নিজের শক্তি সংরক্ষণ করে শত্রুর শক্তি ধ্বংস করা'। আক্রমণ হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করার প্রধান উপায়। সেই সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করাও। কারণ তা না হলে নিজের ধ্বংসও অনিবার্য।

খ. আক্রমণ বলতে সেই পরিস্থিতিকে বুঝায়, যখন শত্রু প্রতিরক্ষায় রত আর অপরপক্ষ আক্রমণে লিপ্ত। শত্রুর প্রতিরক্ষায় রত থাকার সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের সামরিক শক্তিকে বিকশিত করার মাধ্যমে শত্রুশক্তিকে প্রচণ্ড আঘাতে পর্যুদস্ত করা।

গ. এই সময় শত্রুর কার্যকলাপকে অবশ্যই নৈপুণ্যের সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শত্রু পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করলে যাতে করে শত্রুর আক্রমণ শুরু হওয়া মাত্রই কার্যকরভাবে আক্রমণ শেষ করে প্রতিরক্ষা পর্যায়ে প্রবেশ করা যায় এবং সেই প্রতিরক্ষার মধ্য দিয়ে শত্রুর আক্রমণকে যেন চূর্ণবিচূর্ণ করা সম্ভব হয়।

৪. **চলমান যুদ্ধ** (Mobile warfare)

ক. চলমান যুদ্ধ হলো সেই যুদ্ধরূপ, যা দীর্ঘরেখা ও বিরাট যুদ্ধাঞ্চল জুড়ে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক লড়াই। একই সময়ে এ ধরনের যুদ্ধকে সহজসাধ্য করার জন্য প্রয়োজন "চলন্ত প্রতিরক্ষা" ব্যবস্থা। এতে আরো থাকে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণের অবস্থানগত আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আক্রমণাত্মক ও প্রবহমান প্রতিরক্ষা।

খ. "যখন জিততে পারবো তখন লড়ি, আর জেতার আশা না থাকলে সরে পড়ি"—চলমান যুদ্ধের এটাই সহজ ব্যাখ্যা। আর "সরে যাওয়ার" একটি মাত্র উদ্দেশ্য লড়াই অব্যাহত রাখা—এই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত চলমান যুদ্ধের সমস্ত রণনীতি ও যুদ্ধাভিযানের কৌশল।

৫. **পশ্চাদপসারণ**

ক. যখন ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী বৃহৎ শত্রু বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হয়, তখন নিজেদের সৈন্য শক্তিকে সংরক্ষিত করে শত্রুকে পরাজিত করার জন্য

www.pathagar.com

সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকার যে সুপরিকল্পিত কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তাই হচ্ছে পশ্চাদপসারণ।

খ. এর প্রধান লক্ষ্য হলো, শত্রুকে ভুল করতে প্ররোচিত করা। একথা মানতেই হবে যে, যে কোনো সমর নায়ক তা সে যত বিচক্ষণই হোক না কেন, বেশ একটা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কিছু কিছু ভুলত্রুটি এড়াতে পারে না। আর তার রেখে যাওয়া ফাঁকগুলোকে (loop hole) কাজে লাগানো সম্ভব। উপরন্তু, কৌশল খাটিয়েও শত্রুকে ভুল করতে প্রলুব্ধ করা যায়। যেমন পূর্বদিকে আক্রমণের ভান করে পশ্চিম দিকে আক্রমণ করা।

গ. পশ্চাদপসারণের প্রাথমিক অবস্থায় ভূমি হারানোর একটি ব্যাপার আছে। আর এটা প্রায়ই ঘটে। হারিয়েই কেবল হারানোকে ফিরে পাওয়া যায়, এ হচ্ছে নেয়ার জন্য প্রথমে দেয়ার নীতি। সাময়িকভাবে ভূমি হারিয়েও শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন সম্ভব। আর যদি পরক্ষণেই ভূমির পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণ হয় তাহলে সেটা হবে একটি কার্যকর রণকৌশল। যেমন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ঘুমে আর বিশ্রামে সময়ের লোকসান ঘটে, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তাতে আগামীকালের জন্য কর্মশক্তি অর্জিত হয়। যদি কোনো নির্বোধ এটা না বুঝে ঘুমুতে কিংবা বিশ্রাম নিতে অস্বীকার করে, তাহলে পরের দিন তার কোনো কর্মশক্তি থাকবে না এবং যে কোনো মুহূর্তে তার সব কিছু ভেঙে পড়তে পারে। ঠিক একই কারণে সাময়িকভাবে কিছু ভূমি ছেড়ে দিতে অনিচ্ছার ফলে সমস্ত ভূমিকেই হারাতে হতে পারে।

যুদ্ধের নিয়ম (Law of War)

প্রতিটি গতিশীল বিষয়ের মতো যুদ্ধেরও নিজস্ব গতি ও নিয়ম রয়েছে। যুদ্ধের নিয়ম যুদ্ধের সকল বিষয়সমূহের মধ্যকার অবশ্যম্ভাবী সম্পর্ককে এবং এর বিপরীতমুখী সব বিষয়ের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে বুঝায়। বিষয়গুলো হলো: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং প্রাকৃতিক। এই নিয়ম যুদ্ধের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং ঐ সকল বিষয়ের দ্বারা যার উপরে যুদ্ধ নির্ভরশীল। যুদ্ধের নিয়ম বিকাশশীল। কারণ যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়বস্তুই পরিবর্ধিত হয়। সকল যুদ্ধই স্থান কাল ও প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে বিকাশ লাভ করে। যুদ্ধের নিয়ম দু'ধরনের—'সাধারণ ও নির্দিষ্ট'। সাধারণ নিয়ম শাশ্বত যা পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রত্যেক যুদ্ধে একই রকম। নির্দিষ্ট নিয়ম যুদ্ধ বিশেষে এককভাবে বিদ্যমান। সাধারণ নিয়ম এবং নির্দিষ্ট নিয়ম অভ্যন্তরীণভাবে সম্পৃক্ত, যেমন সাধারণ নিয়ম নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে অস্তিত্বশীল এবং নির্দিষ্ট নিয়ম সাধারণ নিয়মের পরিবর্ধন সাধন করে। যুদ্ধের

www.pathagar.com

নিয়মসমূহে আরো কিছু সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, যদি সকল বৈশিষ্ট্যগত বিষয় একই হয় তবে বৃহৎ বাহিনী ক্ষুদ্র বাহিনীকে পরাভূত করবে। দ্বিতীয়ত, যদি উভয় বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সমান হয়, সে ক্ষেত্রে দক্ষতরভাবে পরিচালিত বাহিনী জয় লাভ করবে। তৃতীয়ত, উভয় বাহিনী সকল বিষয়ে সমান হলে মনোবল, দক্ষতা এবং যুদ্ধ জয়ের ইচ্ছা, জয় পরাজয় নিশ্চিত করবে।

যুদ্ধ পরিচালনার নিয়ম (Law of Directing War)

ক. সমর-বিজ্ঞানের কর্তব্য হচ্ছে, যুদ্ধ পরিচালনার সেই সব নিয়মগুলোকে পর্যালোচনা করা, যেগুলো সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। একই সাথে সেই সব নিয়মগুলোকেও যেগুলোর দ্বারা আংশিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

খ. কেবল গভীর মনে শ্রমসাধ্য চিন্তা করেই যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিচালনার নিয়মগুলো অধ্যয়ন করা যায়। এ বিষয়ে যে সমস্যাগুলো অন্তর্ভুক্ত তা হচ্ছে মুখ্যত শত্রু ও নিজেদের মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের বা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যকার সম্পর্কের, অগ্র ও পশ্চাদভাগের মধ্যকার সম্পর্কের লড়াই ও বিশ্রামের মধ্যকার, কেন্দ্রীভূত করা ও ছড়ানোর মধ্যকার, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার মধ্যকার, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসারণের মধ্যকার, মুখ্য আক্রমণ ও সহায়ক আক্রমণের মধ্যকার, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও দ্রুত নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধের মধ্যকার, অবস্থানগত যুদ্ধ ও চলমান যুদ্ধের মধ্যকার, নিজ বাহিনী ও মিত্র বাহিনীর সম্পর্কের, জয় ও পরাজয়ের মধ্যকার, বৃহদাকার ও ক্ষুদ্রাকার বাহিনীর মধ্যকার প্রভৃতি বিষয়গুলির পার্থক্য ও সংযোগের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেয়া অর্থাৎ যুদ্ধ চালনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে সমরনীতির প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা।

গ. যুদ্ধের জয়-পরাজয় যুদ্ধরত পক্ষসমূহের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারাই প্রধানত নির্ধারিত হয়। এছাড়াও উভয় পক্ষের আত্মমুখী পরিচালনার সামর্থের দ্বারাও এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যুদ্ধের মহাসমুদ্রে সমর নায়কদের অবশ্যই দৃঢ়চিত্তে সুবিবেচিত কৌশলে সাঁতার কেটে ওপারে পৌঁছাতে হবে। যুদ্ধ পরিচালনার নিয়ম হিসাবে রণনীতি ও রণকৌশল হচ্ছে যুদ্ধের মহাসাগরে সাঁতার কাটার কলাকৌশল।

ঘ. যুদ্ধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভুত হয় যুদ্ধের একটি বিশেষ সংগঠন ব্যবস্থা, পদ্ধতিমালা ও এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া, যা সৈন্যবাহিনী ও তার সঙ্গে জড়িত সবকিছুর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। এ পদ্ধতি হচ্ছে, যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল আর এই প্রক্রিয়া হলো, এক বিশেষ রূপ-রীতি যার মধ্যে যুদ্ধরত

www.pathagar.com

যুদ্ধাবস্থায় প্রতিরক্ষা অবস্থান হতে পাল্টা আক্রমণ

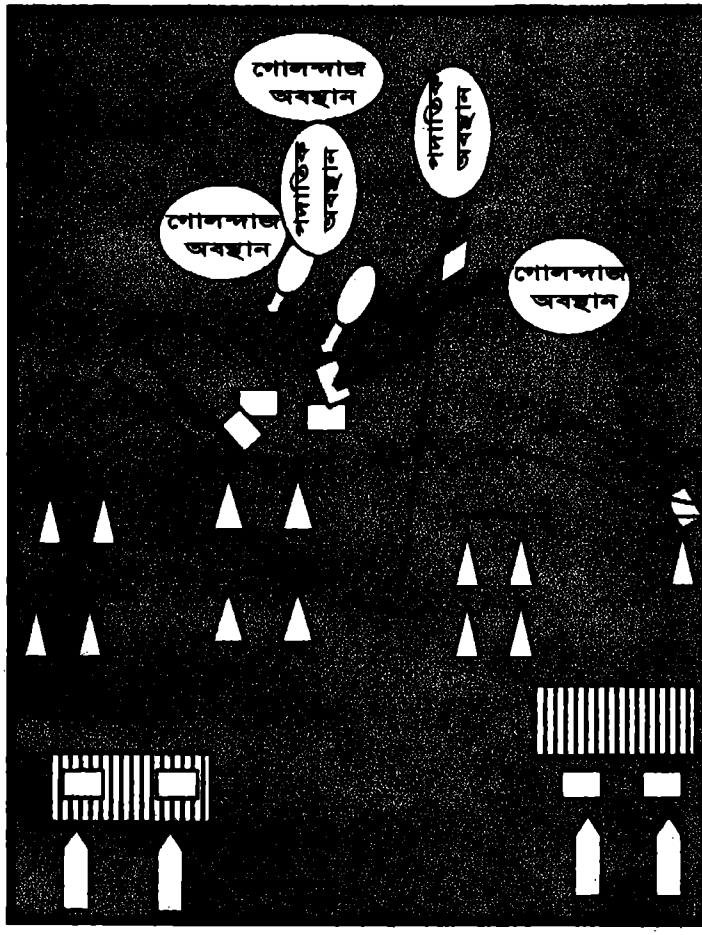

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যুদ্ধাবস্থায় শত্রুকে চলমান যুদ্ধে ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র পূর্বস্থিরিকরণ

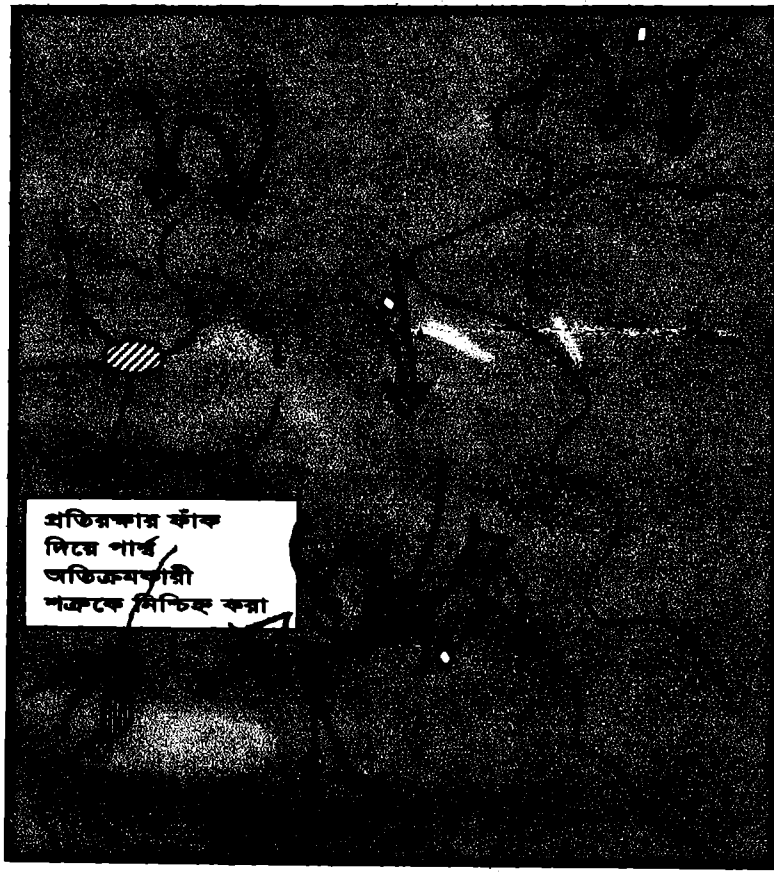

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যুদ্ধাবস্থায় পূর্বে আক্রমণের ভান, পশ্চিমে আক্রমণ

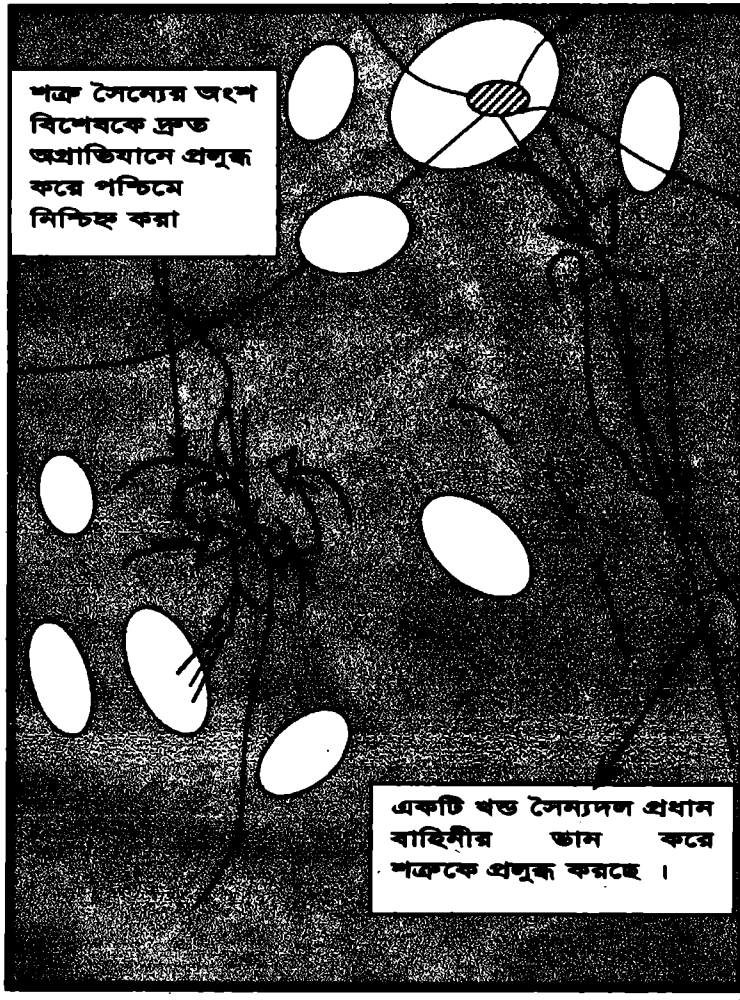

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সমর দর্শনের ক্রমধারা

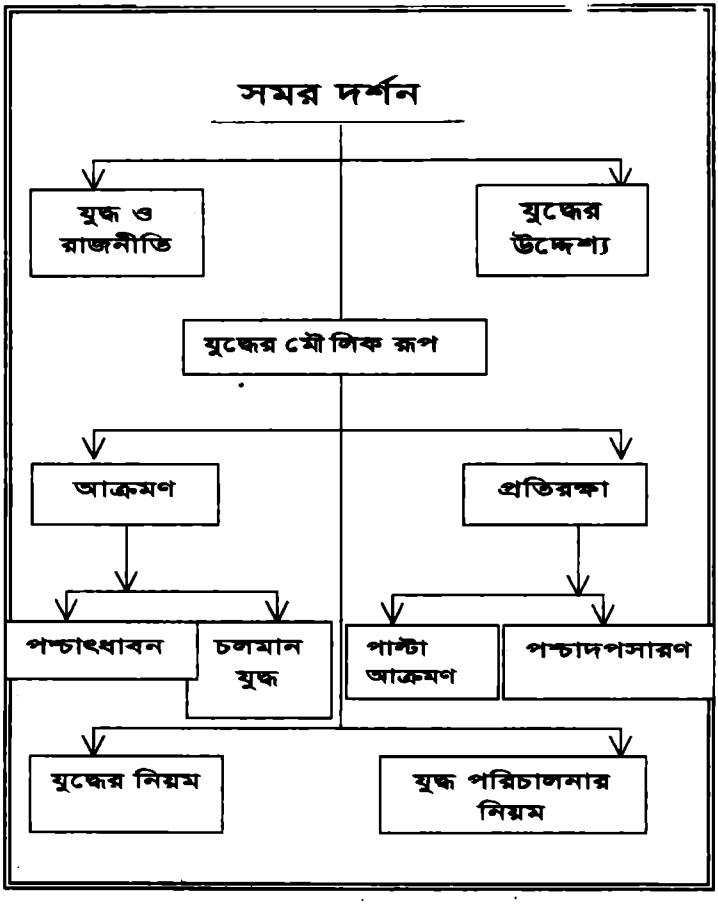

www.pathagar.com

বাহিনীগুলো নিজেদের পক্ষে অনুকূল ও শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিকূল রণকৌশল প্রয়োগ করে একে অপরকে আক্রমণ অথবা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা নিয়ে বিজয় নিশ্চিত করে। তাই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধ পরিচালনাকারী সমর-নায়ককে প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তবতার নিরিখে যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেকে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন। কেবল এভাবেই যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব।

উপসংহার

ক. যুদ্ধের সারমর্ম বা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজেকে রক্ষা ও শত্রুকে ধ্বংস করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধের দুটি মুখ্যরূপ হলো—প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ। কার্যকারিতার মাত্রায় একে শক্তিক্ষয়ী ও নির্মূলকরণের যুদ্ধে বিভক্ত করা যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নির্মূলকরণের এবং অবস্থানগত যুদ্ধ শক্তিক্ষয়করণের কাজ করে। আর এই দুই রূপ-রীতি পরস্পরের থেকে পৃথক হলেও পরস্পরের সম্পূরক।

খ. তত্ত্বের দিক থেকে বলতে গেলে, শত্রুর শক্তিকে ব্যাপকভাবে ক্ষয় করার কৌশলগত লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক পর্যায়ে আক্রমণাত্মক ও আক্রমণাত্মক পর্যায়ে চলমান যুদ্ধের প্রকৃতিকে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। ভারসাম্যের পর্যায়ে শত্রুর আরও বিরাট পরিমাণ ক্ষয়করণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের সকল প্রকৃতিকে অবিরতভাবে ব্যবহার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত শত্রুকে যাতে পরাস্ত করা যায়, তাই পাল্টা আক্রমণের সময়ে নির্মূলকরণের মাধ্যমে শত্রু শক্তি ক্ষয়করণের পদ্ধতিকে অব্যাহতভাবে প্রয়োগ করা উচিৎ।

গ. প্রয়োজনে কিছু ভূমি ছেড়ে দেয়া, সামরিক শক্তি এবং ভূখণ্ড রক্ষার কৌশল বটে। কারণ প্রতিকূল অবস্থায় যদি কিছু অংশ ছেড়ে না দেয়া হয়, তাহলে সামরিক শক্তিকে খোয়ানোর পর যাবতীয় ভূমিও হারানোর সম্ভাবনা থাকে। যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ আঁকাবাঁকা ও আবর্তন-বিবর্তনমূলক। তাই জয়লাভের জন্য সমর নায়ককে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার সাথে রণনীতি এবং রণকৌশল বিজ্ঞানের সফল সমন্বয় ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙালির সামরিক অতীত

বাঙালির সামরিক অতীত সম্বন্ধে জানার আগে বাঙালিরা কারা, তাদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিলো, কখন এবং কিভাবে তাঁরা এ ভূখণ্ডে এলেন, কিভাবে সমাজবদ্ধ হলেন এবং তাঁদের জীবিকা ও প্রকৃতি আদিতে কিরূপ ছিলো তা জানা একান্ত প্রয়োজন। জানা দরকার, বাঙালির জন প্রকৃতি, রাষ্ট্র বিন্যাস ব্যবস্থা ও জয় পরাজয়ের ইতিহাস। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে পারলেই কেবল প্রাচীন বাঙালি জাতির সামরিক শক্তি, সৈন্য-সামন্ত, সমর সম্ভার, সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। এই বিন্যাস মুখ্যত ঐতিহাসিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে ঐতিহাসিক তথ্যাদির বিশ্লেষণে নিজস্ব মতামত ব্যবহার করা হয়েছে। এতে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার থেকে খ্রিস্টাব্দ দ্বাদশ শতকের শেষ পর্ব ও পরবর্তী পর্যায়ে বাংলায় সুলতানি আমল পর্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদি স্থান পেয়েছে। মুখ্যত সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন বাংলা এবং বাঙালির একটা সামগ্রিক রূপ অংকনের প্রয়াস চালানো হয়েছে এই অধ্যায়ে।

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন বাংলা

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করলে আমরা তার সামগ্রিক চিত্রটি বুঝতে পারবো। নিম্নে এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

জন প্রকৃতি : বাঙালির জন প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাঙালিরা একই নরগোষ্ঠীর লোক নয়। বিচিত্র নরগোষ্ঠীর লোক নিয়ে বাঙালি জনের গঠন। আদিম বাঙালির ভিতর যে জনের প্রভাব সব চেয়ে বেশি তারা হলো অস্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসী। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ/ছয় হাজার বৎসর পূর্বে এরা মধ্য ভারত থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারত, সিংহল ও অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিলো। পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইন্দো, আর্য, শক ও পামিরীয়, প্যারোইয়ান, মঙ্গোলিয় ও মালয়-ইন্দোনেশীয় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ বাঙালি জনের সাথে হয়েছে। আর এ জন সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে যে জনের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরাই আজকের বাঙালি জাতি।

www.pathagar.com

সমাজ ব্যবস্থা : প্রাচীন বাঙালিরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে স্বতন্ত্র জীবনযাপন করে। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনে তারা গোষ্ঠী স্বতন্ত্র আচার-ব্যবহার, ধর্ম, বিশ্বাস ও চিন্তাধারা গড়ে তুলেছিলো। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান ও মেলামেশা ঘটে। বড় বড় অঞ্চলে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যেমন বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র ও সুহ্ম সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে এই জনগোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জনপদগুলি বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

জীবিকা : কৃষিকাজ ছিলো আদি অধিবাসীদের প্রধান পেশা। অবশ্য এদের কয়েকটি অরণ্যচারী শিকারজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতাল, নিষাদ, গরদ, ভীল, কোল, সবর ও মুণ্ডা প্রধান। পশু শিকার করার সময় এরা যেসব অস্ত্র ব্যবহার করতো তার মধ্যে ছিলো তীর, ধনুক, বাণ ও পিনাক। অন্যান্য অস্ত্রের মধ্যে দাও-এর ব্যবহারও ছিলো।

রাষ্ট্রীয় চেতনা ও বিন্যাস : বাঙালির রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ভাঙাগড়ার পর্ব শুরু হয় খ্রিস্টাব্দ তৃতীয়/চতুর্থ শতকে। গুপ্ত বংশের শাসনকালে বাংলাদেশ যখন উত্তর ভারতীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনও বাঙালিরা একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন ছিলো। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ/সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম তাম্রলিপ্তি, সমতট ইত্যাদি জনপদে বিভক্ত ছিলো। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে শশাংক গৌড়ের রাজা হন এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকে উৎকল পর্যন্ত সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি বঙ্গ রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারায় সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পাল যুগে বঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তা চারশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ধর্মপাল, দেবপাল ও মহিপালের রাজ্য বিজয়ের কারণে বাংলাদেশ আন্তঃভারতীয় রাষ্ট্রীয় সত্তার রূপ পায়। সেন আমলে বাংলার সামগ্রিক ঐক্য গড়ে ওঠে।

ভৌগোলিক অবস্থান : মোগল আমলে এই দেশ সুবে বাংলা নামে পরিচিত ছিলো। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরির মতে 'বাংলা' শব্দের সঙ্গে 'আল' যোগ করে 'বাংগাল' বা 'বাংগালা' নাম উদ্ভূত হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় গৌড় (মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ও মালদা), পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), বরেন্দ্র (বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর), রাঢ় (মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান), সুহ্ম (হাওড়া, হুগলী, বর্ধমানের অধিকাংশ), তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক শহর ও পশ্চিমবঙ্গ), সমতট (যশোহর, ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চল), হরিকেল চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি জনপদ সমন্বিত ছিলো। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, ভাগিরথী বিধৌত এই ভূখণ্ডের একদিকে উঁচু পর্বত, দুইদিকে শিলাভূমি আর একদিকে বিশাল সমুদ্র, মাঝখানে সমভূমি এই হলো প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান।

www.pathagar.com

যোগাযোগ ব্যবস্থা : প্রাচীন বাংলায় স্থল পথ এবং নদী পথ, এই দুটিরই যথেষ্ট ব্যবহার ছিলো। নদীপথে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য এবং বহির্বিশ্বের সাথে সমুদ্র পথে বাণিজ্য প্রচলিত ছিলো। এই সময় সামুদ্রিক কিছু বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তার মধ্যে তাম্রলিপ্তি ও কোটি বর্ষই প্রধান। খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে রাঢ়দেশীয় রাজপুত্র বিজয় সিংহ সমুদ্র পথে অভিযান চালিয়ে সিংহল দ্বীপ অধিকার করে তাতে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নদীপথে যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য গুঁড়ি কাঠের তৈরি এক প্রকার ডোংগা ব্যবহৃত হতো। তিনটি স্থল পথ প্রাচীন বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত ছিলো। এই স্থল পথগুলো বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন করতো। এই পথগুলোই ছিলো উত্তর ভারতের সাথে প্রাচীন বাংলার বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক যোগাযোগের মূল। বাংলাদেশ ঐ সময় পূর্বদিকে কামরূপের মধ্যদিয়ে চীন ও তিব্বতের সাথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করতো। স্থল পথে যাতায়াতের জন্য যানবাহন হিসেবে গরুর গাড়ি ও ঘোড়া প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতো।

সমরাভিযান : শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভিন দেশীয় পরাক্রমশালী রাজন্যবর্গ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলো। এইসব সমরাভিযানে আগত বিদেশী সেনাবাহিনীর অনেকেই দেশের সৌন্দর্য এবং জীবন ধারায় মুগ্ধ হয়ে বাসিন্দা হিসেবে থেকে যায়। এছাড়া পাল ও সেন আমলের লিপিমালা থেকে জানা যায় যে অনেক অবাঙালি যেমন মালব, গৌড়, খুশ, হুন, কুলিক, কর্ণাট, লাট ও ভট্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা বাংলাদেশে বেতনভুক সৈনিক হিসেবে এসেছিলো। বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে তিনি সমুদ্র পথে সিংহল গমন করেছিলেন এবং একটি দক্ষ ও পরাক্রমশালী সেনাবাহিনীর দ্বারা দ্বীপটি জয় করেছিলেন।

হয়তো সেখানে নৌবাহিনীর ভূমিকাই প্রধান ছিলো। গোপাল দেবের পুত্র ধর্মপাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের কোনো এক সময় বঙ্গের সিংহাসনে বসেন। তিনি স্বল্পকালের মধ্যে সমরাভিযানের মাধ্যমে তাঁর দুর্জয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে ভোজ (বর্তমান মেবারের অংশ), মৎস (আলোওয়ার, জয়পুর এবং ভরতপুরের অংশ) প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (খ্রিস্টীয় ৮১০–৮৫০) বাংলার সিংহাসনে বসার পর হিমালয় থেকে বিন্দু পর্যন্ত এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম তীরবর্তী সমগ্র উত্তর ভারতকে পদানত করেছিলেন। আরব বণিক সোলেমানের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, দেবপালের সেনাবাহিনীতে ৫০,০০০ হাতি ছিলো। সৈনিকদের পোশাক–পরিচ্ছদ ধোয়ার জন্য ১০–১৫ হাজার লোক নিয়োজিত থাকতেন।

প্রাচীন বাংলার সামরিক শক্তি : প্রাচীন বাংলার সামরিক সংগঠন, অস্ত্র, সমর উপকরণ, সাজ–সজ্জা ও রণকৌশল সম্বন্ধে লিপিমালা এবং ঐতিহাসিক তথ্যাদির

www.pathagar.com

সংখ্যা অপ্রতুল। অতীতে এ নিয়ে গবেষণার কাজ খুব একটা হয়নি। তবে সুষ্ঠু গবেষণার মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার সমর শক্তির বিভিন্ন দিকের উদ্‌ঘাটন অসম্ভব নয়। প্রাচীন বাংলায় আমরা সামরিক বাহিনীর সংগঠন হিসেবে যা পাই তা হলো, পদাতিক ও নৌবাহিনী। প্রাচীন বাংলার সেনাবাহিনীতে পদাতিক বাহিনীর গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ছিলো। তবে সেনাবাহিনীতে হাতি ও ঘোড়ার ব্যবহারও যথেষ্ট হতো। পাল বংশীয় রাজা দেবপালের পদাতিক বাহিনীতে হাতির সংখ্যা ছিলো প্রায় পঞ্চাশ হাজার। প্রাচীন গঙ্গা রাষ্ট্রের রাজা উগ্রসেন বিশাল সেনাবাহিনী ও বিপুল ধন-রত্নের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিশ হাজার ঘোড়া, চার হাজার রথ ও ত্রিশ হাজার হাতিসহ এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন।

নদী বিধৌত সাগর মেখলা এই বাংলাদেশের সামরিক সংগঠনে নদী ও সমুদ্রের প্রভাব যথেষ্ট ছিলো। পাল ও সেন আমলে নৌ বিতান-নৌবাট জাতীয় শব্দগুলো প্রায় ব্যবহৃত হতো। বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় মুখ্যত নৌশক্তি দ্বারাই সাধিত হয়েছিলো। এ বিষয়গুলো থেকে বুঝা যায়, প্রাচীন বাংলাদেশ একটি সুদক্ষ নৌবাহিনীর অধিকারী ছিলো।

সামরিক পদবি (পাল পর্ব)

মহাসেনাপতি : যুদ্ধ সম্পর্কিত সর্বোচ্চ রাজ পুরুষ। তিনি সেনাবিভাগের প্রধান কর্মকর্তাদের প্রধান। তার অধীনে যুদ্ধ বিভাগ ন্যস্ত ছিলো। যুদ্ধ ও সেনাবিভাগের প্রধান হওয়ার কারণে মনে হয় তিনি সশস্ত্র বাহিনী প্রধানের অনুরূপ ছিলেন।

মহাপ্রতিহার : উচ্চ সামরিক কর্মকর্তা। তিনি রাজ্যের সীমানা রক্ষায় নিয়োজিত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আধা সামরিক বাহিনীর প্রধানের অনুরূপ ছিলেন। এছাড়াও ছিলো, বলাধ্যক্ষ—পদাতিক বাহিনীর প্রধান ও নৌকাধ্যক্ষ-নৌবাহিনীর প্রধান। গূঢ় পুরুষ—সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা।

সেনাবিন্যাস (পাল পর্ব) : সেনাবিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হলেন মহাসেনাপতি। তার অধীনে অন্যান্য সেনাপতিরা। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক—এই চতুরঙ্গ বল ছাড়াও পাল রাজাদের নৌ বলও ছিলো। এই পাঁচটি বাহিনীর প্রত্যেকটির একজন প্রধান থাকতেন।

সেনাবিন্যাস (কমোজ, বর্মন ও সেনপর্ব)

মহাসেনাপতি এ পর্বেরও সেনাবিভাগের প্রধান কর্তা। অন্যান্য পদবির মধ্যে কোট্টপতি, মহাব্যূহপতি, নৌবলার্ধ, হস্তী ও অশ্বরক্ষক। এ পর্বে কিছু নতুন সামরিক পদবির

www.pathagar.com

পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, মহা পিলু গানস্থ ও বলাধিকরণিক। প্রথমটি হস্তী সৈন্যের অধ্যক্ষ এবং দ্বিতীয়টি সম্ভবত সৈন্য সংক্রান্ত অধিকরণের প্রধান কর্তা, বর্তমানে প্রতিরক্ষা সচিবের সমপদবির কোনো কর্মকর্তা হবেন।

রাজ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা : পাল রাজারা সামরিক ও প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে অনেকগুলো বিজয় স্কন্ধাবার স্থাপন করেছিলেন। এই স্কন্ধাবারগুলো প্রায় নগরীতুল্য এবং এতে রাজপ্রাসাদ, সেনানিবাস, হাটবাজার প্রভৃতি ছিলো। এই স্কন্ধাবারগুলোই বর্তমানের গ্যারিসন অথবা সেনানিবাসের সমপর্যায়ের হবে এবং এতে সেনাবাহিনী ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসকদের অফিস আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ঐ বিজয় স্কন্ধাবারগুলো প্রাচীন রাজন্যবর্গের সামরিক দূরদর্শিতা এবং রণকৌশলগত বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে।

পোষাক ও অস্ত্রোপকরণ : সৈনিকরা উরু পর্যন্ত লম্বা আটো পাজামা ব্যবহার করতো। পাদুকা হিসেবে ব্যবহৃত হতো ফিতাবিহীন এক প্রকার চামড়ার জুতা। যুদ্ধের সময় যোদ্ধারা বর্ম ও লৌহ শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতো বলে মনে হয়। পরবর্তী সময়ে বাঙালিরা লোহা, তামা ও পিতলের ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জন এবং এই ত্রিবিধ ধাতু দ্বারাই অস্ত্র হিসেবে তামার কুঠার, তলোয়ার, তীর, ভীল্লর, বর্শা প্রভৃতি প্রস্তুত করে যার ব্যবহার মোঘল আমল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

নগর বিন্যাস ও প্রতিরক্ষা : প্রাচীন বাংলার নগরগুলো গড়ে উঠেছিলো বিশেষত সামরিক, প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কারণে। ঐ সময় যে সকল বিখ্যাত নগর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো সেগুলো হলো পুণ্ড্রবর্ধন, (বর্তমান মহাস্থানগড়), কোটি বর্ষ (দিনাজপুরের বানগড়), পঞ্চগড় (বর্তমান পঞ্চগড়), কর্ণ–সুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি। এই প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলোর বিন্যাস বিশেষত পুণ্ড্রবর্ধন নগর ও কোটি বর্ষের নগরবিন্যাসে দেখা যায় যে নগরগুলো দুটি অংশে বিভক্ত ছিলো। এর একটি অংশ হচ্ছে প্রকৃত নগর যা উঁচু প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত এবং অন্য একটি অংশ প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত। বর্ণিত নগরবিন্যাস দেখলে বুঝা যায় যে সম্ভাব্য শত্রু আক্রমণ থেকে নগর রক্ষার জন্য সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো।

সুলতানি আমলে বাংলা

সীমান্ত : পূর্ব বাংলা ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা ছিলো গুমতি নদী। উত্তর পূর্ব সীমানায় সিলেট এবং কামরূপ ছিলো সুলতানি বাংলার উত্তর অঞ্চল। উত্তর পশ্চিম সীমানার মধ্যে সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

প্রশাসন : সুলতানি আমলে প্রশাসনের সুবিধার জন্য যেসব পরিদপ্তর কার্যকরী ছিলো সেগুলো হলো, অর্থ, চিঠি আদান–প্রদান, বিচার, পুলিশ ও সামরিক। পুলিশ

www.pathagar.com

পরিদপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন প্রধান পুলিশ অফিসার যাকে কোতয়ালী বলা হতো। সম্ভবত এই পরিদপ্তরে একটি সুসংগঠিত গোয়েন্দা সংস্থাও ছিলো। সুলতানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একজন চীফ গার্ডের অধীনে বেশ কিছুসংখ্যক নিরাপত্তা রক্ষী সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকতো। এছাড়া প্রাসাদের নিরাপত্তা রক্ষায় একজন কমান্ডারের নেতৃত্বে একটি সুসজ্জিত ইউনিট সর্বদা মোতায়েন রাখা হতো। ঐতিহাসিক মাহুয়ানের মতে পনেরো শতকে সৈনিক ও অফিসারগণ নগদ বেতন টাকা ও কড়িতে গ্রহণ করতো এবং উচ্চ সামরিক কর্মকর্তাদেরকে জায়গীর দান করা হতো। বখতিয়ার খিলজী সমগ্র বাংলাকে কয়েকটি সামরিক এলাকায় বিভক্ত করেন এবং প্রশাসক হিসাবে সামরিক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

সামরিক সংগঠন : সুলতানি শাসনের সময় বাংলার সেনাবাহিনী প্রধানত পদাতিক (পাইক), অশ্বারোহী, গোলন্দাজ, হস্তী বাহিনী ও নৌবাহিনী এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিলো। বৈদিক যুগে প্রাচীন ভারতে সেনাবাহিনী চতুরঙ্গ বল অর্থাৎ পদাতিক, হস্তী, অশ্ব ও রথ—এই চার শক্তি সমন্বয়ে সংগঠিত ছিলো। নদ, নদী, খাল ও বিল সমৃদ্ধ বাংলায় রথের ব্যবহার উপযোগী কোনো কালেই ছিলো না বিধায় রথবল বাংলার সেনাবাহিনীতে, এমনকি সুলতানি বাহিনীতেও সংযোজিত হয়নি। পাল পর্ব হতে নৌবল একটি শক্তিশালী অংগ সংগঠন হিসাবে বাংলার সেনাবাহিনীতে সংযুক্ত হয় যা সুলতানি আমলেও অব্যাহত থাকে।

পদাতিক : পদাতিক বাহিনীকে সাধারণত পাইক বলা হতো। পাইক এক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র, যা লম্বায় ৪.২৬ মিটার ছিলো। সম্ভবত পাইক থেকেই পাইক অস্ত্র ব্যবহারকারী পদাতিক বাহিনীর আরেক নাম পাইক হয়ে থাকবে। প্রাচীন ভারতে পদাতিক বাহিনী যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করতো সুলতানি আমলে তার বড় একটা তফাৎ দেখা যায় না। তবে বৈদিক যুগে ধনুর্বাণ এবং অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে শত্রু শিবিরে অগ্নি সংযোগ করা হতো। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, যুদ্ধে বিস্ফোরকের অথবা অগ্নি প্রজ্বালনকারী দ্রব্যাদির ব্যবহার এ অঞ্চলের মানুষ প্রাচীন যুগেই আয়ত্তে এনেছিলো। সুলতানি আমলে কামান ও বন্দুকের ব্যবহার ছিলো অনন্য যা সুলতানি সেনাবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রের বিধাতায় পরিণত করেছিলো।

অশ্বারোহী বাহিনী : এ অঞ্চলে কবে কখন সেনাবহিনীতে প্রথম অশ্বের ব্যবহার হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারত অভিযানের সময় এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। হাইডাসপাসের যুদ্ধে রাজা পুরু তাঁর বাহিনীর দুই পার্শ্বে বর্শা ও ঢাল সজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী মৌর্য রাজাদের সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। কৌটিল্য বলেন, যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনী শত্রুর বিপরীতে, চতুষ্পার্শ্বে, পশ্চাতে

www.pathagar.com

অতিক্রত ধাবমান হয়ে দূরে অবস্থান গ্রহণকারী শত্রু বাহিনীর উপর চক্রাকারে আক্রমণ পরিচালনা করবে। তাঁর মতে অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান কাজ হলো সেনাদলের অগ্রভাগ, পার্শ্বদেশ, পশ্চাদভাগ এবং কভারিং সেনাদল হিসেবে কাজ করা। অন্যান্য কাজের ভেতর শত্রুর অবস্থানে হামলা করা, নিজস্ব অবস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যোগাযোগ রক্ষার্থে বার্তাবাহন এবং দীর্ঘ অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থানের নিরাপত্তা বিধান করা। আলেকজাণ্ডার অশ্বারোহী সৈনিককে অগ্রযাত্রায় স্কাউট হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার কাজেও অশ্বারোহী বাহিনী ব্যবহৃত হতো। মুসলিম বিজয়ের সময় মুসলমান সেনাপতিরা যুদ্ধে ব্যাপকভাবে অশ্বের ব্যবহার করেন।

গোলন্দাজ : প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে যুদ্ধে অগ্নিবাণের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এই অগ্নিবাণের আকৃতি ও গঠন সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। আলেকজাণ্ডার বিভিন্ন যুদ্ধে ক্যাটাপাল্ট ব্যবহার করেন। এ ছিলো এক প্রকার ধনুক যার সাহায্যে বৃহদাকারের লৌহশর নিক্ষেপ করা হতো। নিক্ষেপিত এই শর যে কোনো ধরনের লৌহপাত ভেদ করতে পারতো। গোলন্দাজ সুলতানি সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হতো। এই বাহিনী বিভিন্ন প্রকারের বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান দ্বারা সজ্জিত ছিলো। বাংলার সুলতানরা আরাকান ও ত্রিপুরা রাজ্যের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা সম্ভব হয়েছিলো শক্তিশালী গোলন্দাজ বাহিনীর জন্যই।

হস্তী বাহিনী : এই উপমহাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধে হাতির ব্যবহার দেখা যায়। এর কারণ হয়তো এ অঞ্চলে হাতির সহজলভ্যতা। হাতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং চিকিৎসার জন্য সুপ্রাচীনকালে বঙ্গে হস্তী 'আয়ুর্বেদ' নামক চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিলো। মগধরাজ মহাপদ্মনন্দের সেনাবাহিনীতে হাতির সংখ্যা ছিলো চার হাজার। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বাহিনীতে নয় হাজার হাতি রেখেছিলেন। প্রাচীনকালে যুদ্ধে হাতিকে সাধারণত ভ্যানগার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এছাড়া রাস্তা তৈরি, বাধা ধ্বংস অথবা অপসারণ, দুর্গের দেয়াল অথবা প্রাচীর ভাঙ্গা, শত্রুসেনাকে পদদলিত করা, পার্শ্ব প্রতিরক্ষা, মালপত্র বহন, নদীনালা পারাপার, শিবির নির্মাণ ও হামলা করে শত্রু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা প্রভৃতি কাজে হাতি ব্যবহৃত হতো। সুলতানি সেনাবাহিনীতে হাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। সুলতান নুসরৎ শাহ যুদ্ধে হাতি ব্যবহার করেছিলেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ একটি পরাক্রমশালী হস্তী বাহিনীর অধিকারী ছিলেন।

নৌ বাহিনী : নৌ বাহিনী আবহমান কাল থেকে বাংলার সেনাবাহিনীর একটি প্রধান অঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বঙ্গের পাল রাজাদের সামরিক শক্তি

www.pathagar.com

অনেকাংশে নৌবলের উপর নির্ভরশীল ছিলো। নদী বিধৌত বাংলার প্রতিরক্ষা বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে নৌবাহিনী কর্তৃক নিশ্চিত হতো। আলাউদ্দিন হুসেইন শাহ এবং পরবর্তী সুলতানরা বিভিন্ন যুদ্ধে নৌবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। সুলতানি নৌবাহিনী প্রধানের উপাধি ছিলো মীর–ই–বাহার। আবুল ফজলের মতে নৌবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব ছিলো যাবতীয় যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ, যুদ্ধে হাতি পরিবহনের জন্য নৌযানের ব্যবস্থাকরণ, নাবিক ভর্তি করা, নদী পর্যবেক্ষণ ও খেয়াঘাটের খাজনা আদায় করা প্রভৃতি।

রণকৌশল : পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, প্রাচীনকালে এই উপমহাদেশের সৈন্যবাহিনী চতুরঙ্গ বল অর্থাৎ পদাতিক, হস্তী, অশ্ব ও রথ এ চারটির সমাহারে গঠিত ছিলো। চতুর্বলের মধ্যে পদাতিক ছিলো যুদ্ধের বিধাতা। অন্য তিন বল সম্ভবত পদাতিক বাহিনীর সহায়ক শক্তি এবং বাহন হিসেবে কাজ করতো।

বিন্যাস : যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর বিন্যাস মুখ্যত ভূমি ও শত্রুর আক্রমণের হুমকির উপর নির্ভরশীল। প্রাচীনকালে এই উপমহাদেশে সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের মাঠে ব্যূহ রচনার মাধ্যমে বিন্যাস করা হতো। এই ব্যূহগুলোর নাম—

সুচি : যখন সৈনিকরা অপরিসর গিরিপথের মধ্য দিয়ে একে একে অগ্রসর হতো তখন এই ব্যূহ রচনা করা হতো। সম্ভবত এই ব্যূহ বর্তমানের সিঙ্গেল ফাইল ফর্মেশনের মতো হবে।

মণ্ডল : সমতল ভূমিতে এই ব্যূহ রচনা করা হতো।

দণ্ড : সমতল ভূমিতে এই ব্যূহে বিভিন্ন ডিভিশনের পদাতিক সেনাদের চক্রাকারে এমনভাবে বিন্যাস করা হতো তাতে ভ্যানগার্ড ও ফ্লাংকস–এর সেনাসংখ্যা সমান হতো।

ভীষণ : ভাঙাচোরা ভূমিতে এই ব্যূহ ছিলো উপযোগী।

অসমতা : স্ক্রিন অথবা এ্যাডভান্স পজিশন হিসেবে কোনো ক্ষুদ্র সেনাদলকে প্রেরণ করলে এই ব্যূহ অবলম্বন করা হতো।

ভোগ : এই বিন্যাসে ফর্মেশন এবং ইউনিট সারিবদ্ধভাবে একে অপরের পেছনে অবস্থান নিতো।

কুম্ভির : সম্মুখে শত্রু আক্রমণের ভয় থাকলে প্রাচীনকালে এই ব্যূহ অনুসরণ করা হতো।

ক্রট : পশ্চাতে শত্রু আক্রমণের ভয় থাকলে এই ব্যূহ রচনা করে অগ্রসর হবার উপদেশ দেয়া হতো। এই ব্যূহ বোধ করি বর্তমানের বক্স ফর্মেশনের ন্যায় কোনো ফর্মেশন ছিলো।

সর্বতভদ্রা : যদি শত্রু আক্রমণের ভয় চতুষ্পার্শ্ব হতে আন্দাজ করা যায় তবে এই ব্যূহ রচনা করা হতো। এখনকার ডায়মণ্ড ফর্মেশনের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে।

www.pathagar.com

আক্রমণ পদ্ধতি : সুলতানি আমলে বাংলার সেনাবাহিনী আক্রমণের পদ্ধতি হিসেবে উন্নতমানের রণকৌশল, যা মহাবীর হযরত খালেদ ইবনে ওলিদ প্রবর্তন করেছিলেন, সম্ভবত তাই অনুসরণ করেছিলো। কারণ বাংলার সুলতানদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে আক্রমণের পদ্ধতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আক্রমণের সময় তারা তিন বা তারও বেশি ভাগ করে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধের মাঠে সেনাবিন্যাস করতেন। আক্রমণ সাধারণত শত্রুর পার্শ্বদেশে পরিচালিত হতো। সেনানায়করা পদাতিক বাহিনীকে সারিবদ্ধভাবে সম্মুখে আক্রমণের জন্য পরিচালিত করতেন এবং এভাবেই আক্রমণের ধারা বজায় রাখা হতো।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা : বাংলার সুলতানরা প্রতিরক্ষার জন্যে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহকে নগর ভিত্তিক সামরিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। এছাড়াও রাজমহলের তৈলীগিরি ও সিক্রিগলির মধ্য দিয়ে বাংলার প্রবেশ পথ বৈদেশিক অনুপ্রবেশ থেকে সুরক্ষিত করার জন্য গৌড় নগরীকে সামরিক দিক থেকে সুরক্ষিত করা হয়। দেশের দক্ষিণ পূর্ব অংশের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার জন্য চট্টগ্রাম নগরীর উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। এছাড়াও চট্টগ্রামের অদূরে ফেনী নদীর তীরে একটি মুসলিম সামরিক গ্যারিসন স্থাপন করা হয়েছিলো, যা দেশের দক্ষিণ পূর্ব অংশকে বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতো। এই সামরিক গ্যারিসন স্থাপনের ফলে আরাকানের বিরুদ্ধে বাংলার সুলতানদের অভিযান প্রেরণ সম্ভব হয়েছিলো।

উপসংহার

বাঙালির সামরিক অতীত পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন বাংলা ও সুলতানি আমলে সামরিক ব্যবস্থাদির পরিচয় পেয়েছি। প্রাচীন বাংলায় যেমন আমরা সামরিক বাহিনীর ব্যবহার দেখি, তেমনি সুলতানি আমলেও সামরিক বাহিনীর রণকৌশলগত দিক থেকে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হতে দেখি। বাংলার সামরিক ঐতিহ্য খুঁজতে গিয়ে আমরা বাঙালির শৌর্য বীর্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চাইতে যে কোনো অংশে কম ছিলো না তার প্রমাণ পাই। সেই প্রাচীনকালে এই মহান দেশ ও জাতি শিল্প সৌকর্যে ও সামরিক শক্তিতে আপন মহিমায় উজ্জ্বল ছিলো।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সামরিক সম্ভাবনা

কোনো বিষয়ের সম্ভাবনার ব্যাপারটি মুখ্যত ভবিষ্যতের সাথে জড়িত আর বর্তমানে বসে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা অতি বড় কঠিন কাজ। কারণ আজকে যা বলা হলো ভবিষ্যতে তা সঠিক প্রমাণিত হওয়া সময়ের ব্যাপার। যদি সময় ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অনুকূলে থাকে তবেই আজকের বাণী অনাগতকালে বাস্তবে রূপ নেবে, অন্যথায় নয়। অতএব, ভবিষ্যত সম্বন্ধে যত কম বলা যায়, ততই বেহতের। কোনো বিষয়কে ভবিষ্যতের নিরিখে বিচার করলে প্রধানত এর দুটো দিক প্রতিভাত হবে—প্রথমটি ইতিবাচক, দ্বিতীয়টি নেতিবাচক। কোনো কিছুর নেতিবাচক দিকটি নিয়ে মতামত দেয়া যতটা সহজ, ইতিবাচক দিক সম্বন্ধে কিছু বলা তত সহজ নয়। কারণ নেতিবাচক বিষয়ে মত প্রকাশের স্বপক্ষে প্রমাণিত তথ্যাদি হালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যেমন বাংলাদেশ দরিদ্র, দুর্ভিক্ষপীড়িত অশিক্ষিত ও অদক্ষ জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ একটি দেশ যেখানে খরা, অতিবর্ষণ, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। অতএব এদেশের ভাগ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন এমন নেতিবাচক মন্তব্য করা অতি সহজ। কারণ এর স্বপক্ষে ভুরি ভুরি যুক্তিগ্রাহ্য স্থূল প্রমাণাদি বর্তমানে বিদ্যমান। কিন্তু 'বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় পূর্ণ' বর্তমানে বসে এমন মতামত ব্যক্ত করা কি সহজ? নিশ্চয় নয়। কারণ এ বিষয়ে কোনো কিছু বলতে হলে প্রথমে বাংলাদেশের বর্তমানকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করে তাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত করতে হবে। অতঃপর তারই আলোকে দেশের জন্য একটি উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে, যার অর্জন শ্রমসাধ্য ও সময়ের ব্যাপার হলেও অসম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ইতিবাচক চিন্তা ও ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা। ঠিক একই নেতিবাচক মন্তব্য শোনা যায় দেশের সামরিক সম্ভাবনা সম্বন্ধেও। যুক্তি হিসেবে প্রতিবেশি বৃহৎ সামরিক শক্তির সাথে বাংলাদেশের সমর শক্তির তুচ্ছতা, অর্থনৈতিক অসমতা, আয়তনগত ক্ষুদ্রতা ইত্যকার অনেক কারণ দাঁড় করিয়ে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে প্রমাণ করার প্রয়াস চালনা হয় যে, বাংলাদেশের মতো একটি দারিদ্র্যপীড়িত দেশের সামরিক ভবিষ্যৎ হতাশাজনক ও অনিশ্চিত। অতএব, সামরিক খাতে ব্যয় অপাত্রে ঘৃত বর্ষণ মাত্র। যারা বাংলাদেশের

www.pathagar.com

সামরিক সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করে থাকেন, তাদের সমীপে করজোড়ে নিবেদন করতে চাই যে, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান বাহিনীর সামরিক শক্তি শ্রেষ্ঠত্বের তুলনামূলক বিচার করে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ব্যাপারে যারা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে কেবল নয় মাসের মাথায় স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনে এই বীর জাতি তাদের দেশের উজ্জ্বল সামরিক সম্ভাবনার বিষয়টিকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বল্প পরিসরে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ইতিবাচক দিক নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়াস চালানো হবে, যাতে পাঠকের মনে এ ব্যাপারে একটি অনুসন্ধিৎসার ভাব সৃষ্টি হয়।

সামরিক সম্ভাবনার বিবেচ্য বিষয়

ভবিষ্যৎ সামরিক সম্ভাবনার ইতিবাচক দিকসমূহের অবতারণা ও আলোচনা করতে হলে যে উপাদানসমূহকে বিবেচনায় নিতে হবে সেগুলো হচ্ছে—দেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতিগত সমরূপতা, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক চেতনা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামরিক অতীত ইতিহাস ও জাতীয় মনন। এছাড়াও আরো অনেক বিষয় থাকতে পারে যা দেশ ও জাতিভেদে বিবেচনায় আসা সম্ভব।

ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান : বাংলাদেশের অবস্থান চীনের ইউনান প্রদেশের ৮০ মাইল দক্ষিণে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের প্রায় মধ্যস্থলে, নেপালের দক্ষিণে ১৪ মাইল ব্যবধানে একটি করিডোর দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং মায়ানমার এর মুসলিম অধ্যুষিত আরাকান প্রদেশ সীমায় প্রবাহিত নাফ নদীর পশ্চিমে। বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমানায় বিস্তৃত চীনের ইউনান প্রদেশ হতে সোজা দক্ষিণে ৪০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। চীনের মতো মহাশক্তির ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন নিকটতম একমাত্র জলরাশি এই বঙ্গোপসাগর। ইউনান প্রদেশের দক্ষিণের সীমান্ত হতে মায়ানমার এর উত্তর-পশ্চিমের অঞ্চল, ভারতের সাতবোন সমন্বয়ে যে স্বর্ণ ত্রিভুজ তাতে বসবাসকারী অধিবাসীরা মঙ্গলীয় বংশদ্ভুত, যাদের মনস্তাত্ত্বিক যোগ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জনগোষ্ঠীর প্রায় সবাই বর্তমানে স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে নিয়োজিত। অতএব, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় বিবেচনায় বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ইতিবাচক সামরিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। তদুপরি বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে অবস্থিত, যা তার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব প্রদান করেছে।

ভূ-প্রকৃতি : Every town and village is a defender's dream and a nightmare for anyone planning offensive operations.—Maj. Gen. D. K. Palit (Retd).

www.pathagar.com

বাংলাদেশের উত্তরে গারো পাহাড়, দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম অঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগর সৈকত সংলগ্ন সুন্দরবন একটি বিস্তীর্ণ বনভূমি, যার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদী ও ছোট ছোট খাল এর অভ্যন্তরের গমনাগমনকে বিপদ সংকুল ও ঝুঁকিপূর্ণ করেছে। এসব জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চল ও দুর্গম বনভূমি দীর্ঘস্থায়ী আক্রমণাত্মক গেরিলা যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির সামরিক সম্ভাবনার বিষয়ে পাকিস্তানের তদানীন্তন মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের 'ডিফেন্স অব ইস্ট পাকিস্তান লাইজ ইন ওয়েস্ট পাকিস্তান' এর জবাবে উক্তি করেছিলেন যে, 'ওয়েস্ট পাকিস্তান ইজ ইনডিফেনসিবল। ডিফেন্স অব ওয়েস্ট পাকিস্তান লাইজ ইন ইস্ট পাকিস্তান।' অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান অরক্ষণীয়। পূর্ব পাকিস্তানে দাঁড়িয়েই পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা করতে হবে। ছুরি যেমন সহজে কেক ভেদ করে, হিন্দুস্থানের সাঁজোয়া বাহিনী ঠিক তেমনি সহজেই পশ্চিম পাকিস্তান ভেদ করবে। পক্ষান্তরে নদী-নালা, জঙ্গলবহুল পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুস্থান বাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানের গেরিলা বাহিনীর হাতে নাজেহাল হতে হবে। অধিকন্তু হিন্দুস্থানের অধিকাংশ সামরিক টার্গেট পূর্ব পাকিস্তানের বম্বিং রেঞ্জের মধ্যে হওয়ায় দুর্লঙ্ঘ পূর্ব-পাকিস্তান ভাসমান এয়ার ক্রাফট ক্যারিয়ারের কাজ করবে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে নদী বিধৌত দেশ, যা প্রতিরক্ষামূলক রণকৌশলের জন্য বিশেষ উপযোগী। পৃথিবীর অন্যতম দুটি বৃহৎ নদী এ দেশটিকে মোটামুটি চারটি ভৌগোলিক অঞ্চলেই শুধু বিভক্তই করেনি এর অসংখ্য শাখা নদী, অগণিত হাওড়, বিল ও খাল বাংলাদেশের যোগাযোগ ও চলাচলকে দুর্গম করেছে। বিশেষ করে বর্ষা মওসুমে এসব নদীতে নির্মিত কিছু কিছু পুল ভেঙে দিয়ে অনুপ্রবেশকারীকে কার্যকরীভাবে বাধাগ্রস্ত করে ধ্বংস করা সম্ভব।

প্রাকৃতিক পরিবেশ : গ্রীষ্মকালীন বর্ষণমুখর আবহাওয়ায় দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে জলবায়ুর আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাৎসরিক বারিপাতের মাত্রা এলাকা হিসাবে ১৬০ সে. মি. হতে ৪০০ সে. মি. এর মধ্যে ওঠানামা করে। এ সময় বাংলার পলিমাটি কর্দমাক্ত হয়ে চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে। বর্ষা মওসুমে দেশের প্রবহমান অসংখ্য নদীনালা প্রমত্ত হয়ে ওঠে। ফলে সমগ্র বাংলাদেশ অথৈ জল পরিবেষ্টিত দ্বীপাঞ্চলের আকার ধারণ করে। এ সময়ে এ ভূখণ্ডে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা একটি দুরূহ ব্যাপার। পক্ষান্তরে বর্ষা মওসুমে অনুপ্রবেশকারী শত্রু বাহিনী জলবন্দি হয়ে যাবার কারণে গেরিলা আক্রমণের সহজ শিকারে পরিণত হবে।

জাতিগত সমরূপতা : পূর্বের অধ্যায়েই আলোচনা করা হয়েছে যে, বাঙালির জনপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাঙালিরা এক নরগোষ্ঠীর লোক নয়। বিচিত্র নর-গোষ্ঠীর লোক নিয়ে বাঙালি জনের গঠন। আদিম বাঙালির ভিতর যে জনের প্রভাব

www.pathagar.com

সবচেয়ে বেশি, তারা হলো অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ/ছয় হাজার বছর পূর্বে এরা মধ্য ভারত থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারত, সিংহল ও অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিলো। পরবর্তীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইন্দো, আর্য, শক, পামীরীয়, প্যারোইয়ান, মঙ্গোলীয় ও মালয় ইন্দোনেশীয় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ বাঙালি জনের সাথে হয়েছে। আর এ জন-মিশ্রণের মধ্যদিয়ে যে জনের আবির্ভাব ঘটেছে তারাই আজকের বাঙালি। বাংলাদেশে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১.৪ শতাংশের মতো বাদ দিলে দেশের প্রায় বাদ বাকি সকল মানুষ বাঙালি, যারা একই ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যাদের মূল্যবোধ ও চেতনা একই সূত্রে গাঁথা। এমন অনুপম জাতিসত্তার অধিকারী একটি জাতি দেশের সংকটে ইস্পাত দৃঢ় ঐক্য ও শক্তি নিয়ে বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় বীর বিক্রমে অবতীর্ণ হবে তার প্রমাণ একাত্তরে পাওয়া যায়। সুতরাং ভবিষ্যতেও তারা একইভাবে দেশ মাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে জীবন-মরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে এতো নিশ্চিত করে বলা যায়।

রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক চেতনা : বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ভাঙাগড়ার পর্ব শুরু হয় খ্রিস্টত্তোর তৃতীয়/চতুর্থ শতকে। গুপ্ত বংশের শাসনকালে বাংলাদেশ যখন উত্তর ভারতীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনও বাঙালিরা একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন ছিলো। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ/সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ পুণ্ড্র, গৌড়, সুক্ষ তাম্রলিপ্তি, সমতট ইত্যাদি জনপদে বিভক্ত ছিলো। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে শশাংক গৌড়ের রাজা হন এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ থেকে উৎকল পর্যন্ত সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি বঙ্গ রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারায় সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে বঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তা চারশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ধর্মপাল, দেবপাল ও মহিপালের রাজ্য বিজয়ের কারণে বাংলাদেশ আন্তঃভারতীয় রাষ্ট্রীয় সত্তার রূপ পায়। সেন আমলে বাংলার সামগ্রিক ঐক্য গড়ে ওঠে।

পরবর্তীকালে সুলতানি আমল, অতঃপর মোগল শাসনের পরে ইংরেজ ও পাকিস্তানি কাল। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ কখনও স্বাধীন কখনও পরাধীন থেকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব-এর লড়াইয়ে নিয়োজিত থেকেছে। বাংলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দায়ূদ খাঁ কররানী মোগলদের সঙ্গে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হওয়ার পর ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা নামেমাত্র মোগল সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে। এ সময়ে বাংলার স্বাধীন হিন্দু ও মুসলিম ভূঞাগণ এবং জমিদাররা যুক্তভাবে মোগল অধিকারের বিরুদ্ধে ও তাদের নিজ নিজ স্বাধীনসত্তা রক্ষার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী সম্রাটের বিরুদ্ধে বিশ্ব ইতিহাসের নজিরবিহীন এই বিস্ময়কর সংগ্রামের প্রকৃত ও বিস্তারিত ইতিহাস আজও

www.pathagar.com

রচিত হয়নি। ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত বাংলার ভাটি অচল, কোচবিহার ও কামরূপ রাজ্য মোগল আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিলো। ইংরেজ আমলে সিপাহি বিদ্রোহ, তিতুমীর, দুদু মিয়া, নেতাজী সুভাষ বোসসহ শত শত মহান যোদ্ধা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় বিজাতীয় বশ্যতা স্বীকার করে নেননি। পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনাধীনে বাংলার মানুষ স্বাধিকার অর্জনের রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত হয়ে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রামে ১৯৫২ সালে জীবন বিসর্জন দিয়ে সমকালীন বিশ্বে ইতিহাস সৃষ্টি করে। এ আন্দোলনের পথ ধরেই আসে ১৯৭১–এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা ও দেশ অর্জিত হলো তা বিশ্ব ইতিহাসে একটি অভিনব ও বিরল ঘটনা। কারণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পৃথিবীর কোনো জাতিই কোনোদিন এতো জীবন বিসর্জন দেয়নি। যে জাতি তাদের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক চেতনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হাজার বছর ধরে সংগ্রাম করে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত তা অর্জন করেছে, সে জাতির সামরিক সম্ভাবনা যে সীমাহীন তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

ধর্মীয় বিশ্বাস : "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (সঃ) তাঁর প্রেরিত পুরুষ"—বাংলাদেশের ৮৬.৬ শতাংশ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের মূলমন্ত্র ও মর্মবাণী এই কলেমা। এই কলেমা আল্লাহর একত্ব ও হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর নবীত্বের ঘোষণা দেয় অর্থাৎ কলেমা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতিগত ঐক্য ও মানবজাতির সংবদ্ধতার নির্দেশ করে। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই এই বাণী উচ্চারণের সাথে সাথে একজন মুসলমান আরেক জন মুসলমানের ভাইয়ে পরিণত হয়। তাদের মাঝে মানব সৃষ্ট ভেদাভেদের কোনো অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না। এই কলেমার মধ্যে নিহিত রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। ফলে এই কলেমার উচ্চারক ও অনুসারীগণ আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে মাথা নত করে না।

পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেয় একটি একক ধর্মীয় আদর্শের। কোরআন পাক জাতীয়তাকে সংজ্ঞায়িত করে এমন একটি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের যা একটি একক ধর্মীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ কোরআনে বিশ্বের মুসলমানকে একটি একক জাতীয়তার বা উম্মাহর অংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন আত্মসংরক্ষণের প্রকৃতিগত সংজ্ঞার পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়। কোরআন পাকে বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন প্রতিরক্ষা বিষয়ে অমনোযোগী না হয় এবং প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের ব্যাপারে অহেতুক আত্মপ্রসাদ লাভ না করে। অনুপ্রবেশ ও আক্রমণকারীকে চরমভাবে আঘাত করার নির্দেশ পবিত্র কোরআনে দেয়া হয়েছে। আল্লাহপাক শত্রুর মোকাবেলা করার সময় দৃঢ়তার সাথে তা করতে বলেছেন। প্রতিরক্ষামূলক ও ন্যায় যুদ্ধকে বিশ্বাসীদের জন্য ফরজ করা হয়েছে এবং এই যুদ্ধ

www.pathagar.com

করতে গিয়ে যারা প্রাণ বিসর্জন দেবেন তাদের আল্লাহ পাক শহীদের মর্যাদা প্রদান করবেন। পবিত্র কোরআনে ধর্মযুদ্ধে নিহত শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা মৃত নয়, জীবিত।

পবিত্র ইসলাম ধর্মের মর্মবাণীতে যখন দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সদা প্রস্তুত থাকার, অনুপ্রবেশ ও আক্রমণকারী শত্রুকে দৃঢ়তার সাথে চরম আঘাত করার কঠিন নির্দেশ প্রদানসহ এই যুদ্ধকে অবশ্য কর্তব্য। এই মহান কাজে জীবন বিসর্জনকারীকে পরম পুণ্যবানের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে, তখন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী বাংলাদেশের ৮৬.৬ শতাংশ মানুষ তাদের প্রাণপ্রিয় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কারো সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের তোয়াক্কা না করে এবং কারো করুণা প্রত্যাশী না হয়ে নিজের যা আছে তাই নিয়ে ধর্ম বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে এটাই তো স্বাভাবিক ও বাস্তব সত্য।

উপসংহার

বাংলাদেশের সামরিক সম্ভাবনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ যেমন—ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক চেতনা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাতীয় মনন প্রভৃতি পর্যালোচনা করার পর প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের জন্য কার্যকর অথচ স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা বিনির্মাণে এই উপাদানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূর প্রসারী। ভবিষ্যতের যে কোনো প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা যদি এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহের উপরে ভিত্তি করে রচিত হয়, তবেই তাতে এ দেশের মাটি ও মানুষের শক্তির মহাসমন্বয় সাধিত হবে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

সামরিক সম্ভাবনার আলোকে ২০০০ সাল

"হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

একটি সামরিক বিষয়ে লিখতে গিয়ে আরম্ভেই কবিতার মতো নান্দনিকতার অবতারণা ধান ভানতে শীবের গীত–এর মতো অপ্রাসঙ্গিক ঠেকতে পারে বৈকি। তবে সূচনাতেই কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার লেখা বঙ্গভাষা কবিতাটির প্রথম কয়টি চরণ কেন নির্বাচন করা হলো এ ব্যাপারে একটি কৈফিয়ত দিলেই বোধকরি বিষয়টির মীমাংসা হয়ে যাবে। কবি মাইকেল মধুসূদন যশোহরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণকারী একজন খাস বাঙালি হিন্দু যিনি তার নিজের ধর্ম, নাম, ভাষা–সংস্কৃতি এমনকি বাঙালি হিন্দুর সনাতন বস্ত্র ধুতী–ফতুয়া ত্যাগ করে টাই–কোটপ্যান্ট পরে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বিবাহও করেছিলেন হেনরিএট্টা নামের একজন ফরাসি খ্রিস্টান মহিলাকে। মধুসূদনের ন্যায় 'স্ব–বর্জন ও পর–গ্রহণের' মতো এমন অভিনব ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অন্য কোনো বঙ্গ সন্তান কোনো কালে করেছিলেন কি না জানা নাই। কিন্তু একই ব্যক্তি যখন পরবর্জন করে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করলেন এবং 'অমিত্রাক্ষর ছন্দে'র মতো নতুন কাব্য ধারার শুধু জন্মই দিলেন না, বঙ্গভাষার মতো কবিতায় 'বঙ্গ ভাণ্ডারে বিবিধ রতন'–এর কথাও বললেন এবং তথাকথিত ইংরেজ সাজার বাসনাকে 'পরদেশে কুক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি'র মতো আচরণের সাথে তুলনা করলেন, তখন তা থেকে বিজ্ঞজনের অনেক কিছুই শিক্ষণীয় আছে বলে মনে করি। কারণ বুদ্ধিমানেরা অন্যের অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। মধু বাবুর মতো বাঙালি মাত্রের মধ্যেই 'নিজদেশে পরবাসী' এমন একটি উন্নাসিক ভাব সহজাতভাবে পরিলক্ষিত হয়। এর বহুবিধ কারণ থাকা স্বাভাবিক। তবে বাঙালির জনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে এর একটি সম্ভাব্য কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন, আজ আমরা বাঙালি বলে যাদের জানি তারা সকলে একই জনগোষ্ঠীর লোক নয়।

www.pathagar.com

বিচিত্র জনগোষ্ঠীর লোক নিয়ে বৃহত্তর বাঙালি জনের গঠন। যদিও ঐতিহাসিকরা বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভিতর আদি–অস্ট্রেলিয় (Proto-Austroloid)দের প্রভাব সবচেয়ে বেশি বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু গঙ্গা–করতোয়া লৌহিত্য বিধৌত, সাগর–পর্বতধৃত, রাঢ়–পুণ্ড্র–বঙ্গ–সমতট এই চতুর্জনপদ সমৃদ্ধ বাংলাদেশে প্রাচীনতম কাল হতে আরম্ভ করে তুর্কি অভ্যুদয় পর্যন্ত কত বিভিন্ন জন, কত বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা বহন করে এনেছে এবং একে একে ধীরে ধীরে কোথায় কে কিভাবে বিলীন হয়ে গেছে ইতিহাস তার সঠিক হিসাব রাখে নাই। সজাগ চিত্তের ও ক্রিয়াশীল মননের রচিত কোনো ইতিহাসে তার হিসাব নেই এই কথা সত্য। কিন্তু মানুষ তার রক্ত ও দেহগঠনে, ভাষা ও সভ্যতার বাস্তব উপাদানে এবং মানসিক সংস্কৃতিতে তা গোপন করতে পারেনি। সকলের উপর এই বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রেখে গেছে বাঙালির মন ও মানসিকতায় ও সমাজ বিন্যাসের মধ্যে। এ পর্যন্ত যেসব ইঙ্গিত ধরতে চেষ্টা করা হলো তা বাঙালির গভীর চরিত্র ও জীবন দর্শনগত, যে চরিত্র ও জীবন দর্শন গড়ে উঠেছে বাঙালি জনের গঠন ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও ইতিহাসের আবর্তন–বিবর্তনের সম্মিলিত ফলে। এই চরিত্র ও জীবন দর্শন একাধারে প্রাচীন বাঙালির শক্তি ও দুর্বলতা। উন্নাসিকতা, নিজদেশে পরবাসীভাবে যেমন আমাদের দুর্বলতা, তেমনি নিজের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ধর্মীয় ও গোষ্ঠীস্বার্থের বশবর্তী হয়ে আমরা আপন গৌরবগাঁথাকে একদিকে যেমন ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি পক্ষান্তরে অবলীলায় ভিনদেশী অনুপ্রবেশ/আক্রমণকারীর পক্ষ নিয়ে তাকে বীরের আসনে অধিষ্ঠিত করে তারই গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত ভাববার মতো হীনমন্যতা প্রদর্শন করেছি। উদাহরণ হিসাবে তুর্কি বংশদ্ভুত বিদেশী বখতিয়ার খিলজীকে মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী দ্বারা লক্ষ্মণাবতী বিজয়ী মহাবীর হিসাবে বাংলার ইতিহাসে গৌরবে বরণ করেছি। তেমনি একই ইতিহাসে, লক্ষণাবতীর আপন প্রাসাদের খিড়কী দরজা দিয়ে পলায়নোদ্যত পরাজিত বাংলার শাসনকর্তা লক্ষণ সেনের কপালে নিজ হাতে এঁকে দিয়েছি কাপুরুষতার কলঙ্ক কালিমা। আমরা বাংলার দেশপ্রেমিক শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে ইতিহাসে চিহ্নিত করেছি বিলাসী, নিষ্ঠুর ও নারীলোভী হিসাবে, অন্যদিকে বেনিয়া ইংরেজদের বসিয়েছি রেনেসাঁর অগ্রদূতের আসনে। এমন আত্মহনন কোনো জাতি পৃথিবীতে কখনো করেছে বলে মনে হয় না।

আর আত্মহনন ও হীনমন্যতা নয়। এখন সময় এসেছে লক্ষণ সেন ও সিরাজদ্দৌলাদের পক্ষ নেবার। আগত ২০০০ সালে বাঙালির দুর্বলতাকে রূপান্তরিত করতে হবে প্রবল শক্তিতে। বিশেষ করে সামরিক ক্ষেত্রে। আর এর সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে হবে ১৯৯৯ সালের মধ্যেই যাতে ২০০০ সালে এর সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

অতীত চর্চা

আল্লাহ পাক মহাপবিত্র কোরআন মজিদে উল্লেখ করেছেন "তোমরা ভ্রমণ কর এবং দেখ অতীতে খোদাদ্রোহী মিথ্যাবাদীদের কি পরিণতি হয়েছিল।" অর্থাৎ অতীত বা ইতিহাস হতে জ্ঞান আহরণ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে অপরিহার্য একথা পবিত্র কোরআনে স্বীকৃত। অতএব, জাতির সামগ্রিক অতীত ইতিহাস, বিশেষ করে সামরিক অতীত সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ একটি সুস্থ ও বস্তুনিরপেক্ষ অতীতের জ্ঞান একটি জাতির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রচনার ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। কিন্তু মুশকিল হলো, যেমনটি সূচনাতে বলেছি আমরা আমাদের ইতিহাস রচনায় তেমন নিরপেক্ষতা দেখাতে পারিনি। যদিও বা কিছু রচিত হয়েছে সেসব ধর্মীয় ও গোষ্ঠীস্বার্থের পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। এক্ষণে প্রয়োজন নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের সন্ধান করা এবং অতীতের গৌরবগাঁথা জাতির সামনে তুলে ধরা, যাতে জাতীয় মনন সমৃদ্ধ হয়। একটা প্রশ্ন হয়তো হতে পারে, অতীতে যা অগৌরবের তা বর্তমানে আবিষ্কার করা কি জাতীয় মননকে সমৃদ্ধ করবে? এর জবাবে বলবো, যা সত্য তাই সুন্দর। সত্যমঃ শিবমঃ সুন্দরম। অতীতে কারো ভুলে যদি জাতির হানিকর কিছু হয়ে থাকে তবে ঐ সত্যকে অবশ্যই বর্তমানে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য। এতে লজ্জার কিছু নেই—যা আছে তা গৌরবের। জবর দখলকারী ইংরেজরা বললো, বাঙালিরা বীরের জাতি নয়। অমনি মাথা হেঁট করে বসে রইলাম। একটি বার জানতেও চেষ্টা করলাম না আমাদের সামরিক অতীত কত গৌরবের ছিলো। প্রাচীন সিংহলী পালিগ্রন্থ দীপবংশ মহাবংশ কথিত বঙ্গ ও রাঢ়ধিপ সিংহবাহু ও তাঁর পুত্র বিজয় সিংহের লঙ্কা বিজয় কাহিনী সুবিদিত। এ বিজয় একটি পরাক্রমশালী নৌবাহিনী দ্বারা অর্জিত হয়েছিলো এতে সন্দেহ নাই। সিংহলী ঐতিহ্যের মতে এ ঘটনার তারিখ এবং বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের তারিখ (অর্থাৎ ৫৪৫ খ্রিস্টপূর্ব) একই। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০–৩০০ গঙ্গা রাষ্ট্র, গঙ্গা ভাগিরথীর পূর্ব তীরে অবস্থিত ও বিস্তৃত ছিলো।

দিয়োদরশ, কার্টিয়াস–প্রার্তাক–সালিনাস, প্লিনি–টলেমি ও স্ট্রাবো প্রভৃতি গ্রীক ও লেটিন ঐতিহাসিকদের মতে এই রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন উগ্রসেন। এই গঙ্গা রাষ্ট্রের সুবৃহৎ সৈন্য এবং তার প্রভূত ধনরত্ন পরিপূর্ণ রাজকোষের সংবাদ আলেকজান্ডারের শিবিরে পৌঁছিলে তিনি বিপাশা পার হয়ে পূর্বদিকে আর অগ্রসর হবার সাহস না করে বেবিলনে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। যিশু খ্রিস্টের জন্মের বহু পূর্বে সেই প্রাচীনকালে যখন এদেশ ও জাতি সুসভ্য, শৌর্যবীর্যে, শিল্প সৌন্দর্যে ও সামরিক শক্তিতে মহাপরাক্রমশালী তখন আজকের নব্য ও তথাকথিত সভ্য ইংরেজ জাতির জন্ম তো হয়ই নি, তার বহু শতবর্ষ পর পর্যন্ত এরা এ্যাংলো ভেণ্ডেল বর্বর ও দস্যু কৌম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলো যারা খানাবধুসের মতো এক স্থান হতে অন্য স্থানে জীবিকার অন্বেষণে ঘুরে বেড়াত। এই

www.pathagar.com

ইংরেজরা ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বাঙালিদেরকে বীরের জাতি নয় বলে যখন হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াশ চালায় তখন আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। কারণ প্রত্যেক বিজেতা দর্পিত উন্নাসিকতায়, বিজিত অন্যতর জাতি, অন্যতর আচার-ব্যবহার,অন্যতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অন্যতর ভাষাভাষি লোকদের এভাবেই সম্বোধন করেছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৫০০ বৎসর অগে ভারতে অনুপ্রবেশকারী আর্যরা বাংলাদেশের সেই সময়ের অধিবাসীদের অবজ্ঞাভরে দস্যু ম্লেচ্ছ, পাপ ও অসুর ইত্যাদি ভাবে আখ্যায়িত করতো এবং তাদের ভাষাকে তুলনা করতো পাখির ভাষার মতো দুর্বোধ্যতার সাথে।

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের প্রকৃত ইতিহাস পক্ষপাত দুষ্টতার নিগঢ়ে বন্দি হয়ে আছে। কিভাবে ইতিহাসকে নিগড়মুক্ত করা যায়, এমন একটা সমস্যা থেকেই যায়। এ বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক নজিরের উপস্থাপনা এ সম্বন্ধে একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে। কেনিয়া যখন ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন হলো, তখন কেনিয়ার জাতির পিতা জোমো কেনিয়াত্তাকে, ইংরেজদের সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করা হলে তিনি উক্তি করেন যে, 'ইংরেজরা যখন প্রথম কেনিয়ায় আসেন তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল এবং আমাদের হাতে ছিল রাজ্য। ব্রিটিশরা আমাদের হাতে বাইবেল ধরিয়ে দিয়ে বলল, চোখ বন্ধ কর। আমরা চোখ বন্ধ করলাম। তারা আবার বলল, এবার চোখ খোলো। আমরা চোখ খুলে দেখি তাদের বাইবেল আমাদের হাতে এবং আমাদের রাজ্য তাদের হাতে চলে গেছে'। এর মর্মোদ্ধার করলে এই দাঁড়ায় যে ব্রিটিশদের ধর্ম প্রচারের নামে কেনিয়ায় আগমনটা ছিলো লোক দেখানো। এর অন্তরালে ছিলো কেনিয়া দখলের গভীর ষড়যন্ত্র।

ধর্মের নাম করে পর রাজ্য দখলের এমন সুগভীর ষড়যন্ত্র, ধাপ্পাবাজি ও ছল চাতুরীর প্রকৃত ইতিহাস মহান ইংরেজ জাতি তাদের ইতিহাস গ্রন্থে সঠিকভাবে লিখেছেন বলে মনে হয় না। এদিকে সে সময়ের কোনো কেনিয়াবাসীও হয়তো বা প্রভু তোষণের নামে কিংবা নিগৃহীত হবার ভয়ে ইংরেজদের এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা প্রকৃতভাবে ইতিহাসবদ্ধ করেছেন এমন আশা করা যায় না—অন্তত ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার ইতিহাস রচনার অভিজ্ঞতার আলোকে তা বলা যায়।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, কোনো জাতি যেমন তার মাঝে প্রবাহিত বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারাকে গোপন করতে পারে না, তেমনি কেনিয়াতেও ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ও কুশাসনের প্রকৃত ইতিহাস আজো বেঁচে রয়েছে কেনিয়াবাসীর মুখে মুখে, তাদের লোক গাঁথায় ও কিংবদন্তিতে। যদি আগামী হাজার বছরেও তা লেখা না হয় তবে এভাবেই তা কেনিয়ার আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াবে-হাজার বছর ধরে। ইংরেজরা আমাদের বাংলাদেশও জবর দখল করেছিলো। তবে কেনিয়ার মতো ধর্ম প্রচারকের বেশে নয়, এসেছিলো বেনিয়ার ভেক্ ধরে। ব্যবসার নামে রাজ্য দখলের একই ষড়যন্ত্র তারা এই

www.pathagar.com

বাংলাতেও করেছিলো। ব্রিটিশ পাদরীরা এদেশে ধর্ম প্রচার যে করেনি, তা নয়। দুর্মূখেরা বলে, ইংরেজ ফাদাররা ধর্ম প্রচার ও চিকিৎসা প্রদান দুটো কাজ এক সাথে করতো এবং এর মাঝে নিহিত ছিলো তাদের এদেশের ধর্মপ্রাণ সহজ–সরল মানুষদের ধর্মান্তরিত করার একটি সুগভীর ষড়যন্ত্র। ইংরেজদের ধর্ম প্রচারক সাজাটা ছিলো সাধারণ মানুষের সামনে নিজেকে একজন নিবেদিত ও ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। আসল ষড়যন্ত্র নিহিত ছিল চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন রোগী এলে প্রথমে তারা তাকে শুধু পানি দিয়ে বলতো এটা তোমার ভগবানের নামে দিলাম। এতে অসুখ তো সারতো না। পুনরায় এলে একইভাবে পানি দিয়ে বলতো, এবারে আল্লাহর নামে দিলাম। কেবল পানি তো অসুখ সারবার কথা নয়। তৃতীয়বার এলে এ সময়ে প্রকৃত ওষুধ দিয়ে বলতো এবারে প্রভু যিশুর নামে দিলাম। খেয়ে দেখো, তোমার অসুখ ভালো হয়ে যাবে। হতোও তাই। রোগমুক্ত ঐ ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাতো যে প্রভু যিশুর কৃপায় সে ব্যাধিমুক্ত হয়েছে। একটা জঘন্য ছলনা ও ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে ঐ সহজ–সরল ব্যক্তিটি স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে যেতো। এছাড়া অন্যান্য প্রলোভন তো ছিলোই। তথা কথিত বক ধার্মিক খ্রিস্টান ফাদাররা এ জঘন্য কাজটি করেছিলো বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসকদের সম্পূরক হিসাবে। কেনিয়ার মতো এদেশেও এ জঘন্য ধাপ্পাবাজির ইতিকথা যদিও কেউ লিখে রাখে নি বোধগম্য কারণে। তবুও তা রয়ে গেছে মাটি ও মানুষের মাঝে।

অতএব বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস যদি জানতে হয় তবে যেতে হবে এদেশের মানুষের কাছে, মাটির কাছে। একে সন্ধান করতে হবে তাদের লোকগাঁথায়, লোক–সংস্কৃতিতে এবং কিংবদন্তির মাঝে। লাইব্রেরী বা আর্কাইভসে বসে মোটা মোটা বইয়ের পাতায় এর নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

অতীতের আলোকে সামরিক সূত্র নিরূপণ

এ বিষয়ে অগ্রসর হবার আগে বড় যে জিজ্ঞাসাটির সম্মুখীন হতে হবে তা হচ্ছে আজকের ২০০০ সালের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হাজার বছরের অতীতের সামরিক সূত্র খতিয়ে দেখার বা তার সন্ধান করার বাস্তব সম্মত কোন উপযোগিতা আছে কি? যদি বা তার আবিষ্কার সম্ভবও হয় তবে এ মুহূর্তে এই অতি প্রাযৌক্তিক চাপ বোতামের যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে তার প্রয়োগ আদৌ সমীচীন হবে কি? এ কি কোনো সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে? যে কাল কালের গর্ভে হয়েছে বিলীন যে দিন হয়েছে বাসী সে দিনে ফিরে যাবার মাঝে এক ধরনের মোহ থাকা স্বাভাবিক, তবে অনেকের মতে তা ছিন্নমালার ভ্রষ্ঠকুসুম কুড়ানোর মতই পণ্ডশ্রম বৈ নয়। এর জবাবে বলব, পবিত্র কোরআন পাকে জ্ঞানের তিনটি সূত্র বর্ণিত হয়েছে : প্রথমটি , ইতিহাস, দ্বিতীয়টি, প্রকৃতি এবং তৃতীয়টি,

www.pathagar.com

অনুভূতির অন্তর্নিহিত ঐক্য। অতএব দেখা যাচ্ছে ইতিহাস বা অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানে জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয় তার ক্ষেত্র যাই হোক না কেন? এ জন্যই আল্লাহ পাক মানুষদের সরেজমিনে অতীতের ঐতিহাসিক পরিণতিসমূহ অবলোকন করে তা থেকে শিক্ষা লাভ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিরূপণের জোর তাগিদ দিয়েছেন। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জ্ঞানকে বলা হয় চিন্তা শক্তি। অর্থাৎ চিন্তার দ্বারা সৃষ্ট অনুভূতিকেই বলা হয় জ্ঞান। এক্ষেত্রে যদি অতীত সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকে তবে চিন্তার শক্তি সঞ্চয় হবে কোন আধার হতে? এবং কিভাবেই বা তা অনুভূতির সৃষ্টি করবে যা জ্ঞানে পর্যবসিত হবে। অনেক মনীষীর মতে বর্তমান বলে কিছু নেই যা আছে তা অতীত ও ভবিষ্যৎ। অতএব অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। অতীতের ঘটনা বর্তমানে আমাদেরকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করে? সে সম্বন্ধে এভাবে বলা যায়, যেমন নবাব শায়েস্তা খাঁর শাসনামলে সুবে বাংলায় টাকায় ৮ মন চাল পাওয়া যেত। এটা একটা ঐতিহাসিক সংবাদ যা আমাদেরকে ঐ সময়ের বাংলার অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানী ও কৌতুহলী করে তুলে। কিংবা অন্ধকূপ ও জীয়ন কূপের গল্প। প্রথমটিতে পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু, দ্বিতীয়টির জল স্পর্শে নব জীবন লাভ হতো। হতে পারে এতে কল্পনা আছে আছে রহস্যময়তা। কিন্তু সত্য যে, একেবারেই নেই তাই বা বলি কি করে। আজকে তো ট্রেঞ্চ, ডিচ ও মৃত্যুফাঁদ (কমান্ডোরা কুয়ো খুঁড়ে তার নিচে পাঞ্জি লাগিয়ে উপরে ক্যামোফ্লাজ করে রাখে) যুদ্ধে অহরহ ব্যবহার হচ্ছে। জীয়ন কূপ সম্বন্ধে বলবো এটা হয়তো যুদ্ধের মাঠে এমন সব আন্ডার গ্রাউন্ড অবস্থান ছিলো, যেখানে 'আনকমিটেড রিজার্ভ' লুকিয়ে রাখা হতো। যখন যুদ্ধরত সৈন্যরা মারা পড়তো তখন এসব অবস্থান হতে সৈন্য সরবরাহ করে তাদের সংখ্যা পূরণ করা হতো। প্রতিপক্ষের যাদের এ ধরনের রিজার্ভের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিলো না, তাদের এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে মৃত সৈনিকদের এসব কূপে ফেলামাত্র পুনরায় জীবন্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসছে। ফলে মরার পরেও সংখ্যার ঘাটতি হচ্ছে না। অতএব এমন কূপ জীয়ন কূপ না হয়ে পারে না। প্রাচীনকালে এই বাংলার পরাক্রমশালী রাজন্যবর্গ দুর্ধর্ষ চতুরংগ বল (হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক) ও নৌ বাহিনীর অধিকারী ছিলেন। সংগত কারণে ঐ মহাবলশালী পঞ্চবাহিনীর জন্য দেশজ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ও মানানসই (ভূ-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) একটি উন্নত সমর দর্শন ও সামরিক সূত্র যে ছিলো তা নিশ্চিত করে বলা যায়। দেশজ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ও মানানসই এজন্যই বলছি যে, ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-৩০০ পর্যন্ত আলেকজান্ডারই একমাত্র বিদেশী নৃপতি যিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি গঙ্গা রাষ্ট্রের পরাক্রমের ভয়ে বিপাশা পার হয়ে এই বঙ্গে আসেননি। তাই ঐ সময় এই ভূখণ্ডে বিদেশী প্রযুক্তির আগমনের প্রশ্নই উঠে না। অতএব এই ঐতিহাসিক সংবাদে আমরা যে দিক নির্দেশনা পাচ্ছি তা হলো, দেশজ প্রযুক্তি নির্ভর ভূ-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানানসই একটি

www.pathagar.com

সমর দর্শন ও সামরিক সূত্র হলে প্রাচীনকালের ন্যায় আজও বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। এই মুহূর্তে যা বড় প্রয়োজন তা হচ্ছে, সেই স্বর্ণযুগের হারিয়ে যাওয়া সমর দর্শন ও সামরিক সূত্রকে আবিষ্কার করা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যে। যিশু খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে সানযু তার 'আর্ট অভ ওয়ার'–এ যা বলে গেছেন, বিংশ শতাব্দীর চীন তা থেকে বিচ্যুত তো হয়ই নি বরং তারা তা নব প্রযুক্তির আলোকে তাদের সমর দর্শন ও সামরিক সূত্রে পূর্ণভাবে আত্তীকরণ করেছে। এ সমর দর্শন ও সামরিক সূত্র তাদের একান্ত নিজের। যেমন টানেল ওয়ার ফেয়ার ভিয়েতনামের একান্ত নিজের। আমাদের নিজস্ব সমর দর্শন ও সমর কৌশল যে ছিলো তা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায়। যেমন সম্রাট আকবরের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলার বার ভূঁইয়ারা যে সমর কৌশল ব্যবহার করেছিলেন এটা ছিলো এমন একটি চলমান যুদ্ধ (মোবাইল ওয়ারফেয়ার), যার সাথে চীনাদের চলমান যুদ্ধের কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকরের ন্যায় এই যুদ্ধ কৌশলও যে চীন প্রাচীনকালে এদেশ হতে তাদের দেশে নিয়ে যায়নি, তাই বা বলি কিভাবে?

পরিশেষে বলবো অতীতের প্রযুক্তি বর্তমানের চেয়ে অনুন্নত ছিলো এমন কথা ধোপে টিকে না। কারণ অতীতের অনেক নিদর্শন বর্তমান কালের বিস্ময় হয়ে আছে। যেমন পিরামিড, তাজমহল, চীনের প্রাচীর প্রভৃতি। এর একটিরও নির্মাণ আমাদের পক্ষে সম্ভব কি? অতএব অতীতের আলোকেই ভবিষ্যতের সামরিক সূত্র নিরূপণ করা যুক্তিযুক্ত ও সমীচীনও বটে। আর এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি যত তাড়াতাড়ি করা যায়, ততই মঙ্গল।

২০০০ সালে সামরিক লক্ষ্যমাত্রা

উপরের অনুচ্ছেদে পরিব্যক্ত হয়েছে এমন একটি সামরিক সূত্র ও সমর দর্শনের ধারণা, যার নাড়ির যোগ রইবে এ দেশের ভূ–প্রকৃতির সাথে। আর এই সামরিক সূত্র ও সমর দর্শনের অন্তর্নিহিত মূল শক্তি সঞ্চিত হবে এদেশের মাটি ও মানুষের সম্মিলিত/সমন্বিত মহাশক্তির আধার হতে। এবং এই উভয়বিধ ধারণার অর্জন পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হবে দেশজ প্রযুক্তি ও সমরসম্ভারের উপরে। কারণ যে সূত্র ও দর্শন উৎসারিত হয়েছে এদেশের বুক থেকে তার অর্জন নির্ভরশীল হবে দেশীয় প্রযুক্তি ও সম্ভারের উপরে, এতো যুক্তির কথা। যে প্রযুক্তির সমরসম্ভার নির্মিত হয়েছে অন্যদেশে, তা এদেশের জন্য ১০০% উপযোগী হবে এ কি করে ভাবা যায়? তবে হ্যাঁ, ভিন দেশের প্রযুক্তি ও সমরসম্ভারকে দেশজ প্রযুক্তি ও সমরসম্ভারে আত্তীকরণ করলে ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে তা দেশজ রূপই ধারণ করে।

অনেক মনীষীর মতে সামরিক সূত্র ও সমর দর্শন–এর ধারণা বিনির্মাণে এক বা একাধিক শত্রুকে বিবেচনায় নেয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ শত্রুকে মোকাবেলা করার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে নিজস্ব ভূমিকা একান্তভাবে আক্রমাণাত্মক না প্রতিরক্ষামূলক কিংবা উভয়ের সংমিশ্রণে আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা বা অন্য কিছু হবে, তা নির্ধারিত হবে শত্রুর সামগ্রিক অবস্থান বিবেচনার দ্বারা এবং সেই নিরিখেই নিজ দেশের সামরিক বাহিনীর আদল গড়ে উঠবে। এই ধারণার সাথে একমত পোষণ করে বলা যায় যে, শত্রুকে বিবেচনা করতে গিয়ে যদি শত্রুর যা আছে আমাদেও তা থাকতে হবে কিংবা তার কাছাকাছি অবস্থানে পৌছতে হবে এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়, তাহলে তা একটি অসম প্রতিযোগিতার জন্ম দেবে যাতে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা বেশি। বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, যার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এমন দুটি মহা ও মধ্যশক্তির মাঝখানে যাদের সামরিক শক্তি বিশ্বমানের। তবে হ্যাঁ, শত্রুর যা আছে আমাদের তা থাকতে হবে তা নয় ; বরং আমাদের যা আছে তা দিয়েই শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। কারণ শত্রুশক্তির সমকক্ষতা বা সমতা শত্রুর যা আছে তা দিয়ে নয় বরং নিজের যা আছে তার দ্বারা অর্জন করা সম্ভব। এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মহাবিজয়ের মধ্য দিয়ে। এদেশের আপামর জনসাধারণ ও সামরিক বাহিনী তাদের যা ছিলো তা নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনে শত্রু মোকাবেলায় মাটি ও মানুষের মহাশক্তি ও দেশজ প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টিকে চিরদিনের জন্য যৌক্তিকতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ভবিষ্যতে এদেশকে যদি আরও হাজারটি যুদ্ধ করতে হয় তবে এই হাজারটিতেই জয়লাভ করতে হলে বাংলাদেশকে যুদ্ধ করতে হবে মহান মুক্তিযুদ্ধের ধাঁচে। কারণ নিজের যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হবার মর্মবাণীর মাঝে সামরিক ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের মূল সুর নিহিত। কারণ দেশের মাটি ও মানুষের শক্তির মাত্রা অপরিমিত আর দেশের সামরিক শক্তি যদি এই দুই অফুরন্ত আধারের উপরে বিশেষ করে সম্ভার ও জনশক্তির ক্ষেত্রে নির্ভরশীল হয়, তবে দেরীতে হলেও শক্তি ও স্বয়ম্ভরতা উভয় লাভ করা সম্ভব।

সামরিক সংগঠন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাকাতে হবে এদেশের ভূ-প্রকৃতির দিকে। আমাদের নদী, পাহাড়, বনভূমি, সুন্দরবনসহ দিগন্ত বিস্তৃত সাগর সৈকত, অবারিত মাঠ, আটষট্টি হাজার গ্রাম, শহর, বন্দর, হাট, ঘাট, হাওর, খাল, বিল কিসের ইঙ্গিত বহন করে, তার তাৎপর্য অনুধবান করে এর প্রতিফলন আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সংগঠন ও বিন্যাসে সহজাতভাবে ঘটাতে হবে। এরজন্যে প্রয়োজন একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যমাত্রা ও সমন্বিত পরিকল্পনা, যা অর্জিত হবে ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে।

উপসংহার

বাংলাদেশের প্রাণশক্তির আধার এ দেশের মাটি ও মানুষ। আর এই শক্তির অন্তর্নিহিত মর্মবাণীকে আত্মস্থ করতে হলে জানতে হবে এদেশের অতীত ও ক্রম-বিবর্তনের

www.pathagar.com

ধারাকে। এই জানা যত নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হবে, জাতীয় মনন হবে ততই সমৃদ্ধ। এর জন্য প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, জাতীয় ইতিহাসকে ধর্মীয় ও গোষ্ঠী স্বার্থের নিগড় মুক্ত করা। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন জাতীয় মানসে নিজ দেশে পরবাসী ভাব থেকেই যাবে। ফলে সামগ্রিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। ভাল, মন্দ, গৌরব, অগৌরব সব মিলিয়েই আমাদের অতীত—আর এর মাঝে নিহিত রয়েছে এই মহান জাতির শক্তি ও দুর্বলতা। এই ঐতিহাসিক সত্যের তাৎপর্যকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেই কেবল এই দেশ ও জাতির জন্য দুই হাজার সালে একটি সম্ভাবনাময় সামরিক লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণ সম্ভব, যার সূত্র ও দর্শনের মর্মমূলে এ দেশের মাটি ও মানুষের সমন্বিত মহাশক্তি ও প্রকৃতির সহজাত প্রতিফলন ঘটবে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ভূ-রাজনীতির নিরিখে যুদ্ধের সম্ভাব্য প্রবণতা বিশ্লেষণ ও যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণ

হরিণের আকর্ষণীয় শরীর ও লোভনীয় মাংস যেমন শিকারীকে প্রলুব্ধ করে, তেমনি একটি দেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও সম্পদরাশি একইভাবে বৈদেশিক শক্তির শোষণ ও আক্রমণের শিকারে পরিণত হতে পারে। অতীতে এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশকে আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়াটা ছিলো একরূপ চিরায়ত প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার। যে ক্ষেত্রে দুর্বল কিংবা পরাজিত দেশের সন্ধির প্রস্তাব শক্তিধর ও বিজয়ী কর্তৃক অনুমোদিত হতো, সেক্ষেত্রে ঐ দেশকে সন্ধির শর্তানুযায়ী কর প্রদান করতে হতো যুগ যুগ ধরে। সেকালের মতো একালে যদিওবা দেশ দখল এবং কর প্রদানের মতো যুদ্ধের ফলশ্রুতি এক হিসেবে বিলুপ্ত প্রায়, তবে যুদ্ধের কারণ ও ফলশ্রুতি অতীতের মতো বর্তমানেও বিদ্যমান রয়েছে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত রূপে। কারণ এখনও যুদ্ধ হচ্ছে, এখনও এক দেশ অন্য দেশকে শোষণ করছে—করদ রাষ্ট্রের মতো। প্রশ্ন হচ্ছে, অতীতের মতো বর্তমান সভ্য যুগে একটি শান্তিপূর্ণ দেশ না চাইলেও কেন সে অন্যের আক্রমণ ও শোষণের শিকারে পরিণত হচ্ছে? কেন তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য দেশ হস্তক্ষেপ করছে? এ নিশ্চয়তা কি একটি দেশকে দেয়া যাবে যে, সে শান্তির পথে থাকলে এবং অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে তাকে কেউ শোষণ কিংবা আক্রমণ করবে না? পদাবলী কাব্যের 'মেরেছো কলসীর কানা—তাই বলে কি প্রেম দেব না?' চরণটি এর ইতিবাচক পরিণতির পোষকতা করে। অর্থাৎ একজন রূপসী নারীর শেষ অবধি কলসির কানা নিক্ষেপ করেও উপযাচক প্রেমিকের হাত হতে যেমন শেষ রক্ষা হয় না, তেমনি একটি দেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, তার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ যদি হরিণের শরীর ও মাংসের মতো অন্যের কাছে আকর্ষণীয় এবং লোভনীয় হয়, তবে শত শান্তির বাণীও ঐ দেশটিকে বৈদেশিক শোষণ, আক্রমণ ও আগ্রাসনের হাত হতে রেহাই দিতে পারবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে, ভূ-রাজনীতির অমোঘ নিয়মেই যুদ্ধ প্রবণতার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এখানে কারো চাওয়া বা না চাওয়ার তেমন একটা মূল্য আছে বলে মনে হয় না। আলোচ্য প্রবন্ধে ভূ-রাজনীতির নিরিখে যুদ্ধ প্রবণতাসমূহকে বিচার করে একটি দেশের জন্য তার সম্ভাব্যতা কতটুকু তা বিশ্লেষণ করার একটি প্রয়াস চালান হয়েছে, যাতে দেশের ভূ-রাজনীতির সঠিক মূল্যায়ন সাপেক্ষে যুদ্ধের সম্ভাব্য প্রবণতার

www.pathagar.com

উপাদানসমূহ চিহ্নিত করা যায় এবং এর বিপরীতে যথাযথ যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করা সম্ভব হয়।

যুদ্ধ প্রবণতা বিশ্লেষণ

এ বিষয়ে আলোচনায় যাবার পূর্বে প্রথমেই যুদ্ধের কারণ ও প্রবণতার মধ্যকার তফাৎটুকু নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। তা না হলে যুদ্ধের কারণ ও প্রবণতাকে সমার্থক হিসেবে দেখবার একটা সমস্যা থেকেই যাবে। যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে সমরবিশারদগণ অনেক মতামত দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে—আধিপত্যবাদী দীর্ঘমেয়াদি নেতৃত্ব, আন্তর্জাতিক নীতি পদ্ধতির কাঠামোর উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও পরিবর্তন, প্রযুক্তির প্রসার, সম্পদ নিয়ন্ত্রণ, বাজার দখলকরণ এবং জাতির সম্প্রসারণবাদী মনোভাব ইত্যাদি। উপরোল্লিখিত কারণসমূহ সম্বন্ধে মনীষীদের মাঝে ভিন্নতা থাকলেও যুদ্ধের মূল কারণ বলে অর্থনৈতিক বিষয়কেই সবাই এককভাবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ পৃথিবীতে খুব কমই যুদ্ধ হয়েছে যার মূলে অর্থনৈতিক ব্যাপার জড়িত ছিলো না।

এবার যুদ্ধ প্রবণতার দিকে নজর দিলে প্রতিভাত হবে যে, এই বিষয়টি এমন সব উপাদান হতে উৎসারিত যা নিহিত রয়েছে দেশের ভূ-রাজনীতির মাঝে। অতএব একটি দেশ কি পরিমাণ যুদ্ধপ্রবণ, তা নিশ্চিত করতে হলে দেশটির ভূ-রাজনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই করতে হবে। কারণ এই বিশ্লেষণের দ্বারা ভূ-রাজনীতির মাঝে সাময়িক ও স্থায়ীভাবে বিরাজমান যুদ্ধ প্রবণতার উপাদানসমূহকে চিহ্নিত করা যাবে, যা ঐ দেশের যুদ্ধ প্রবণতার একটি সময় ও পরিমাণগত দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। যেহেতু এক দেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান অন্য দেশের মতো নয়, তাই উপাদানগত ভিন্নতার কারণে যুদ্ধ প্রবণতার দিক থেকে এক দেশ হতে অন্য দেশ আলাদা হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধ প্রবণতা ভূ-রাজনীতির অন্তর্নিহিত উপাদানগত বিষয়, আর যুদ্ধের কারণ একটি বাহ্যিক ও পারিপার্শ্বিক ব্যাপার। নিম্নে যুদ্ধ প্রবণতার কিছু উপাদান তুলে ধরা হলো।

ভৌগোলিক অবস্থান

একটি দেশের সম্পূর্ণ কিংবা কোনো বিশেষ অঞ্চল বা স্থান দেশটির জন্য যুদ্ধ প্রবণতার উপাদান হয়ে আবির্ভূত হতে পারে, যদি অন্য কোনো বিশেষ দেশের স্ট্রাটেজিক ও রাজনৈতিক মহাপরিকল্পনার স্বার্থে তার নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ উভয় ভাবেই হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে স্বাগতিক দেশটি, ঐ বিশেষ দেশের ক্রমাগত আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হবার ফলে যুদ্ধপ্রবণ হয়ে পড়বে। যেমন, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে চীনের

www.pathagar.com

স্ট্রাটেজিক ও রাজনৈতিক মহা-পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় সম্পূর্ণ তাইওয়ান যুদ্ধপ্রবণ হয়ে পড়েছে। কোনো বিশেষ অঞ্চল বা স্থানের বেলায় বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তালপট্টি দ্বীপের কথা বলা যেতে পারে।

সম্পদ

এখানে সম্পদ বলতে এমন সব বস্তুগত উপাদানকে বুঝানো হয়েছে, যা একটি দেশকে টিকে থাকতে ও উন্নতি করতে সহায়তা করে, বিশেষ করে সামরিক ক্ষেত্রে। খুলে বললে এভাবে বলা যায়, এগুলো এমন সব উপকরণ ও খনিজ সম্পদ যা সামরিক অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় এবং যুদ্ধকালীন সময়ে বেসামরিক অর্থনীতিকে সচ্ছল রাখে। তৈল, গ্যাস, ইউরেনিয়াম ও সিরামিক উপকরণ প্রভৃতি এগুলোর মধ্যে অন্যতম। একটি দেশের সামরিক শক্তি অর্জনে ও যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

কোনো শক্তিধর দেশ সামরিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশেষ করে যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধোপকরণ তৈরিতে সহায়ক স্ট্রাটেজিক ম্যাটেরিয়াল এর সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যুদ্ধ মহাপরিকল্পনায় তার দেশের বাইরে ঐসব অঞ্চল ও স্থানের দখল অন্তর্ভুক্ত রাখবে, যেখানে এসব উপকরণের মজুদ রয়েছে। কারণ যুদ্ধের জন্য 'স্ট্রাটেজিক ম্যাটেরিয়ালে'র ক্ষেত্রে নিজ দেশের ভূমিসীমার মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া কোনো দেশের পক্ষেই এককভাবে প্রায় অসম্ভব। অতএব, সমুদয় বিষয়টি জিও-স্ট্রাটেজিক ধারণার সাথে সুদূর অতীতের ন্যায় বর্তমানেও জড়িত হয়ে আছে। প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশের সম্পদ সমৃদ্ধ কোনো অঞ্চল বা স্থান বৃহৎ শক্তির যুদ্ধ মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হলে ছোট দেশটি ক্রমাগত আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হবে, যা তার সার্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দেবে। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে গালফ অঞ্চলে বৃহৎ শক্তির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সাম্প্রতিককালের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সুবিধা প্রদান

চানক্যের মতে, 'প্রতিবেশীর প্রতিবেশী নিজ দেশের বন্ধু'—রাজনৈতিক এই শ্লোকের মর্মোদ্ধার করলে এই দাঁড়ায় যে, একই ভূমি সীমার অংশীদার প্রতিবেশী দেশের সাথে নিজ দেশের সম্পর্ক হবে শত্রুতামূলক। পক্ষান্তরে প্রতিবেশীর প্রতিবেশীর সাথে ভূমিসীমার অংশীদারিত্ব থাকার ফলে উভয়ের মাঝে শত্রুতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে। অতএব, চানক্যের রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী প্রতিবেশীর প্রতিবেশী হবে নিজ দেশের বন্ধু। যে সকল ক্ষুদ্র দেশের ভৌগোলিক অবস্থান দুই বড় শক্তির মধ্যে বা কোনো

www.pathagar.com

আঞ্চলিক শক্তির ভূমিসীমা কিংবা প্রভাব বলয়ের মাঝে, সেসব দেশের উপর শক্তিধর দেশের চানক্যের বন্ধুত্ব ও শত্রুতার রাজনৈতিক দর্শন এমন সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপের সৃষ্টি করে যা দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দেয়। বৃহৎ প্রতিবেশী ছোট দেশকে যেসব ছাড় দিতে চাপ সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রধান হলো, চলাচল সুবিধা প্রদান। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কোনো বিশেষ অঞ্চলে বা রাজ্যে স্বল্প ব্যয়ে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে ক্ষুদ্র দেশটির ভূমি ও বন্দর ব্যবহার করা, যুদ্ধকালীন সময়ে সৈন্য ও সমর সম্ভার বহনের সুবিধা আদায় এবং সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সম্মতি অর্জন প্রভৃতি। অতীতের ন্যায় বর্তমানেও অনেক ক্ষুদ্র দেশ বড় দেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপে এ সকল সুবিধা প্রদানে বাধ্য হচ্ছে এবং যুদ্ধপ্রবণ হয়ে পড়ছে।

পানি সম্পদের ব্যবহার

পানির অপর নাম জীবন। এই পানি জীবন ধারণে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে জীবনীশক্তি হিসেবে কাজ করে। বিশ্বের বেশিরভাগ বাণিজ্য সমুদ্র ও নদীপথে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সমুদ্রের পানি, মৎস্য ও খনিজ সম্পদ যেভাবে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনে, ঠিক সেভাবেই নদ–নদীসমূহ কৃষি উন্নয়নে সহায়তা ও মরুকরণ প্রক্রিয়া হতে দেশকে রক্ষা করে। ভূ–গর্ভস্থ পানির স্তর স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়, যদি নদ–নদীসমূহে বর্ষা ও শীত উভয় মৌসুমে পানির প্রবাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। প্রবাহ কমে গেলে ভূ–গর্ভস্থ পানির স্তর বেশি নিচে নেমে যাবার ফলে সমুদ্র নিকটবর্তী অঞ্চলে লবণাক্ততার সম্প্রসারণ ঘটে এবং সেচের পানির অভাবজনিত কারণে কৃষি উৎপাদনে চরম ঘাটতি দেখা দেয়। অন্যদিকে পানীয় জলের অভাবসহ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রাগত বৃদ্ধির ফলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতির কারণ হয়।

যেসব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান স্থলবেষ্টিত ঐ সকল দেশ শক্তিশালী নৌবাহিনীর অধিকারী না হবার ফলে তাদের পক্ষে সমুদ্র ও সমুদ্র ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে দেশগুলির অর্থনৈতিক ও জাতীয় শক্তিতে এক ধরনের স্থায়ী অপূর্ণতা থেকেই যায়। এই ভৌগোলিক অবস্থানজনিত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে অতীতের মতো বর্তমান শতকেও কোনো কোনো দেশ সমুদ্র পথ উন্মুক্ত করতে মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। জার্মানীর দু–দুটি বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পেছনে অনেক কারণের মধ্যে দেশের জন্য সমুদ্রপথ উন্মুক্ত করাও একটি বড় কারণ ছিলো। ফলে অনেক দেশ জার্মানীর আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছিলো।

একই স্থল সীমার অংশীদার প্রতিবেশী দেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টন অতীতের মতো সাম্প্রতিককালেও এক ধরনের টানাপোড়েন ও সমস্যা হয়ে আছে। কখনও বিষয়টি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যুদ্ধের কারণও হয়েছে। অতএব,

www.pathagar.com

পানি সম্পদের ব্যবহারজনিত সমস্যা সমাধান করতে অনেক দেশ যুদ্ধপ্রবণ হয়ে পড়েছে এবং ভবিষ্যতেও পড়বে।

জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মীয় স্বার্থ সংরক্ষণ

এ ধরনের স্বার্থ সংরক্ষণের পরিণতি অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি বিশেষ দেশ, জাতি, গোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য চরম বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। আর এসব স্বার্থ সংরক্ষণের পিছনে সেই সব দেশ, জাতি, গোষ্ঠী বা ধর্ম বিশ্বাসীদের হীন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কাজ করেছে, যার উদ্দেশ্য ছিলো কোনো বিশেষ অঞ্চলের মূল্যবান সম্পদ শোষণ করা, অথবা বিশেষ জাতি-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি সাধন করে সেখানে নিজ সম্প্রদায় বা জাতি-গোষ্ঠী জনগণের জন্য বৃহত্তর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। ইংগ-মার্কিন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে উদাহরণ আকারে তুলে ধরা যায়, যার পশ্চাতে মূল উদ্দেশ্য ছিলো আরব বিশ্বের তেল সম্পদকে করায়ত্ত্ব করা। এ জন্য ইতোমধ্যে আরবদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দিতে হবে। সাম্প্রতিককালে বলকান অঞ্চলে স্লাভ জনগোষ্ঠী ও বিশেষ ধর্ম বিশ্বাসীদের জন্য বৃহত্তর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের বেদীতে হাজার হাজার নিরাপরাধ বসনীয় মুসলমান নারী, পুরুষ ও শিশুকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে।

বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে, এ্যাথনিক ক্লিঞ্জিং এর নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নির্মূল করার মতো হিংসাত্মক ও লোমহর্ষক কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড এবং ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ যুদ্ধপ্রবণ হয়ে পড়তে পারে।

পুনঃএকত্রিকরণ

ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে কেবল রাজনৈতিক, জাতিগোষ্ঠীগত এবং ধর্মীয় দাবি মেটাতে যে সকল দেশ বা অঞ্চলকে বিভাজিত করা হয়েছিলো, জিও-স্ট্রাটেজির অমোঘ নিয়মেই সেগুলোর পুনঃএকত্রিকরণের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে কোথাও কোথাও সম্পন্ন হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে আন্দোলন চলছে সরবে। বাকিদের বেলায় এক ধরনের আত্মিক ও মানসিক আত্মিকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে একান্তে ফল্গুধারার মতো। এরও বহিপ্রকাশ কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র। তবে কোন পক্ষ এর সূচনা করবে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভক্ত দেশের বা অঞ্চলের যে অংশটি শক্তিধর দেশের অঙ্গীভূত, একত্রিকরণের দাবি যদি সে দিক থেকে উত্থাপিত হয় তবে ক্ষুদ্র অংশটি প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রভাবিত ও অপর অংশের প্রতি আকর্ষিত হবে এবং যুদ্ধপ্রবণ হয়ে পড়বে। ন্যূনতম শক্তির ভারসাম্যই কেবল এ ক্ষেত্রে দেশের সার্বভৌমত্ব

www.pathagar.com

ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে পারে। তা না হলে জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণ

দেশের জন্য একটি যুৎসই যুদ্ধ কৌশল (War Strategy) নির্ধারণে ভৌগোলিক অবস্থান মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যেহেতু ভূ-রাজনীতির সাথে ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই যুদ্ধ কৌশল নির্ণয়ের সময় রাজনৈতিক ও স্ট্রাটেজিক স্তরে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা অপারেশন ও ট্যাকটিক্যাল স্তরের ভুল সংশোধনযোগ্য হলেও রাজনৈতিক ও স্ট্রাটেজিক স্তরের ভুল জাতির জন্য স্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। অতএব দেশের জন্য নির্ভুল যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণ করতে হলে সমরবিদ ও রাজনীতিজ্ঞ উভয়কে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণের সময় আরো যে দুটি বিষয় বিবেচনায় নেয়া দরকার তা হচ্ছে, দেশের আয়তন বা গভীরতা এবং সম্পদ। যেসব দেশের আয়তন ও সম্পদ সীমিত তাদের জন্য 'স্বল্প মেয়াদি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ কৌশল' সমধিক উপযোগী। গভীরতা কম হবার জন্য এ সকল দেশের 'ভূমির বিনিময়ের সময় ক্রয় বিক্রয়ের' বিলাসিতার যেমন অবকাশ নেই, তেমনি সম্পদ কম থাকার জন্য এদের পক্ষে দীর্ঘ মেয়াদি কনভেনশনাল যুদ্ধও পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। Trading space for time এবং দীর্ঘ মেয়াদি কনভেনশনাল যুদ্ধ সম্পদশালী বৃহৎ দেশের পক্ষেই আনজাম দেয়া সম্ভব, ক্ষুদ্র ও গরিব দেশের পক্ষে নয়। এখানে যুদ্ধ প্রবণতার উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে গিয়ে প্রকারান্তরে সীমিত সম্পদ ও ক্ষুদ্র আয়তনের দেশসমূহের ভূ-রাজনৈতিক বিষয়কেই তুলে ধরা হয়েছে। এতে আরো যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো, চিহ্নিত উপাদান হতে উৎসারিত প্রবণতার কারণে যুদ্ধ প্রাথমিক পর্যায়ে সীমিত আকারে থাকবে। এই প্রাথমিক পর্যায়েই ক্ষুদ্র ও সীমিত সম্পদের দেশটিকে যুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটাতে হবে Short lived violent offensive war strategy এর দ্বারা। কোনোক্রমেই যুদ্ধকে দীর্ঘ মেয়াদি বা দ্বিতীয় পর্যায়ে যেতে দেয়া সমীচীন হবে না। এর জন্য সীমিত space এ পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে শত্রু দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু দখলে নিতে হবে, যা পরবর্তীতে দর-কষাকষির মূল্যবান উপাদান আকারে যেন আবির্ভূত হয়। যুদ্ধ সম্প্রসারণের প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু হবে যুদ্ধাঞ্চলের গভীরে শত্রুর সামরিক ও অর্থনৈতিক স্থাপনার উপরে বোমা বর্ষণের দ্বারা, যাতে শত্রুর মনোবল ও সমরশক্তি কার্যকরীভাবে ধ্বংস করা সম্ভব হয়। Ground offensive-এ Joint Warfare নীতিমালার অনুসরণ, সমরাধিনায়কের শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা, কুশলী বিচার বিশ্লেষণ এবং অভিনব রণকৌশল যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সমর শক্তিকে যেন কার্যকরীভাবে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

পরিশেষে যে সকল দেশের গভীরতা কম তাদেরকে বাহিনীত্রয়ের ন্যায় Intelligence network–কেও প্রথম সারির প্রতিরক্ষা হিসেবে সমদক্ষতায় গড়ে তুলতে হবে, যাতে শত্রুর পরিকল্পনা সম্বন্ধে আগাম অবহিত হওয়ার মাধ্যমে একদিকে শত্রুর তরফ হতে Surprise এড়ানো ও একই সাথে পূর্ণ রণ–প্রস্তুতি গ্রহণ করে শত্রুকে সময়োচিত জবাব দেয়া সম্ভব হয়।

উপসংহার

যুদ্ধ প্রবণতার উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটি দেশ কি পরিমাণ যুদ্ধ প্রবণ তা ভূ–রাজনীতির বিশ্লেষণ সাপেক্ষে নিশ্চিত হওয়া, যাতে দেশবাসী এ ব্যাপারে সতর্ক হয় এবং এর বিপরীতে যথাযথ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে অবহেলা ও সময়োচিত প্রতিক্রিয়ার অভাবের দরুন অনেক জাতি তাদের সার্বভৌমত্ব হারিয়ে পরাধীনতাকে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। কোনো স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ ও জাতির জন্য তা কাম্য হতে পারে না। যুদ্ধ প্রবণতার বিষয়টি যেহেতু ভূ–রাজনীতির অন্তর্নিহিত উপাদানগত ব্যাপার, তাই একটি দেশ যতদিন অস্তিত্বে থাকবে ততদিন প্রবণতার আশংকাও বিদ্যমান রইবে যৌক্তিক কারণে।

অতএব, সমর দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা—এই সূত্রকে সামনে রেখে জাতির সমরবিদ ও রাজনীতিজ্ঞ উভয় সমষ্টি তাদের যৌথ উদ্যোগে দেশের জন্য উপযোগী যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণ করবেন, যার সফল ও সময়োচিত প্রয়োগ জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করবে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

একটি সামরিক পরিকল্পনার সন্ধানে

সাধারণ্যে নিরাপত্তা পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে প্রচলিত ধারণা বিদ্যমান তাতে সামরিক বিষয়সমূহকে এককভাবে একীভূত করে একে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার সমার্থক হিসাবে দেখবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে প্রতিভাত হবে যে,প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা সমার্থক কোনো বিষয় নয় ; বরং উভয়ে একটি সামরিক মহাপরিকল্পনার অংশ মাত্র। অতএব প্রাথমিকভাবে দেশের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা ও চেতনাকে সঠিকভাবে বিন্যাস করতে হলে, একটি সামগ্রিক সামরিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই তা করা যুক্তিযুক্ত হবে। অর্থাৎ প্রথমে জাতীয়ভাবে একটি সামরিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তাতে এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা সমগ্র জাতিকে দেশের ঐসব সামরিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে যা দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় অস্তিত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় একান্ত অপরিহার্য। এগুলো হচ্ছে, সামরিক শিক্ষা, সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের আলোকে দেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা প্রদান, সামরিক লক্ষ্য অর্জনে দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিকল্পনা নিরূপণ এবং জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষণে নিরাপত্তার বিষয়টির সামরিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ ইত্যাদি। জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়সমূহকে দেশের সচেতন নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী মহলকে অবহিত করতে হবে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে যা করা হবে বহুবিধ আন্তঃযোগাযোগের মধ্যদিয়ে, যাতে তাদের মাঝে এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এইসব বিষয় উচ্চতর পর্যায়ের পাঠক্রমেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ফলে দেশবাসী ও সামরিক বাহিনী যেন সামরিক ঐকমত্যের বেদীতে একই সাথে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

সামরিক শিক্ষা

সামরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য চিন্তার সামরিকীকরণ নয়। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামরিক বিষয়ে মুক্ত চিন্তার বিকাশ সাধন করা। এই শিক্ষার দ্বারা চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রসমূহকে

www.pathagar.com

এমনভাবে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করা, যাতে মুক্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে সামরিক বিষয়সমূহের গুরুত্বকে উপলব্ধিতে এনে তা মুক্ত চিন্তায় ধারণ করা সম্ভব হয়। আর এই চিন্তার আদান-প্রদানের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে সামরিক বাহিনী ও জনগণের মাঝে নানাবিধ আন্তঃযোগাযোগ ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে। মুক্ত চিন্তার কথা এ জন্যই বলছি যে, চিন্তার সমৃদ্ধি ও বিকাশ একমাত্র মুক্ত পরিবেশেই সম্ভব। যেহেতু জ্ঞানকে বলা হয় চিন্তাশক্তি, তাই কোনো বিষয়ে জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করতে হলে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, চিন্তাকে সংকীর্ণতার অর্গলমুক্ত করা। সামরিক বিষয়টি এর কোনো ব্যতিক্রম নয়। অন্যথায় সামরিক বিষয়ে মুক্ত চিন্তা ও বিকাশের বিষয়টির একটি সামগ্রিক অপূর্ণতা থেকেই যাবে, যা মঙ্গলজনক নয়। কোনো কিছুকে বিচ্ছিন্ন রেখে মহান কিছু অর্জন করা যে সম্ভব নয়, তার প্রমাণ সাম্প্রতিক কালের বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে কম্যুনিজমের মহাপতন। গত সত্তর বছর লৌহ যবনিকার অন্তরালে কম্যুনিজমের সমৃদ্ধি ও বিকাশের একটানা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করেও এর সমৃদ্ধি ও বিকাশ কোনোটাই হয়নি। বরং চিন্তা-চেতনার দৈন্যতার কারণে ভিতরে ভিতরে তা ফোকলা হয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে দীর্ঘ সাত দশক পর লৌহ যবনিকার অন্তরালে এই তথাকথিত মহাপরিকল্পনার মহাযবনিকাপাত ঘটে। বর্তমান যুগ মুক্ত চিন্তা-চেতনা বিকাশের যুগ। গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসার পৃথিবীর আয়তনকে ছোট করে এনেছে। আজকের সমৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন সকলের মাঝে আন্তঃযোগাযোগ, আদান-প্রদান ও মত বিনিময়। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'। তিনি আরো বলেছেন, 'আজ দখিন দুয়ার খোলা এসো হে'— অর্থাৎ মুক্ত মানসিকতা নিয়ে নিজেকে মেলাতে হবে অনেকের সাথে, আহ্বান করতে হবে অনেককে নিজের কাছে। আর এভাবেই সামরিক শিক্ষার মধুরেণ সমাপয়েৎ নিশ্চিত হবে।

ভূ-রাজনৈতিক বিষয় ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা

ভূ-রাজনীতির সংজ্ঞা কি তা বিদগ্ধ পাঠকমাত্রের জানা। তাই এ বিষয়ে বেশি কিছু না বলাই শ্রেয়। তবে এটুকু বলবো যে, ভূ-রাজনীতি বা Geopolitics কথাটির মূলে রয়েছে geography ও politics। অর্থাৎ দেশের geography বা ভূমির অবস্থানের সাথে Politics বা রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক। অতএব দেখা যাচ্ছে, geography ও politics এর আন্তঃসম্পর্কের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান। যেহেতু কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের তেমন কোনো পরিবর্তন সহসাই হয় না, অন্যদিকে রাজনীতি সময়ের সাথে পরিস্থিতি নির্ভর ও পরিবর্তনসাপেক্ষ। তাই রাজনীতির মূল উপজীব্য সে দেশের geography বা ভৌগোলিক অবস্থান। অর্থাৎ ভূমিকে ঘিরেই একটি দেশের রাজনীতি আবর্তিত হবে, রাজনীতিকে ঘিরে ভূমি নয়। কারণ ভূমির অবস্থান

www.pathagar.com

শাশ্বত আর রাজনীতি পরিবর্তনশীল। অতএব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান যেভাবে দিক নির্দেশনা দেবে, সেভাবেই দেশের রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রণীত হবে।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভিন্নতর হবার কারণে রাজনৈতিক নির্দেশনা ও পরিকল্পনা এক এক রকম হয়ে থাকে। যেমন ইংল্যান্ড ও ইসরাইলের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ঐ দেশ দুটির রাজনৈতিক পরিকল্পনাকে ভিন্ন খাতে প্রণীত করে। ইসরাইলীদের কাছে আরবদের শত্রুতার মুখে তাদের জন্য দেশের ভূখণ্ডগত নিরাপত্তাই মুখ্য। অন্যদিকে ইংল্যান্ড বৃহত্তর ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশীদার ও নেটো জোটভুক্ত হবার কারণে দেশটি ভূখণ্ডগত আগ্রাসনমুক্ত হওয়ায় ব্রিটিশদের রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রাথমিকভাবে বিশ্বব্যাপী ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে নিয়োজিত। এদিক থেকে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় নিলে এদেশটিরও রাজনৈতিক ধারা ও পরিকল্পনা অন্যান্য সব আঞ্চলিক দেশসমূহ হতে ভিন্নতর হবে এটাই স্বাভাবিক।

ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণে দেশ বিশেষে রাজনীতি এক এক ধারার হলেও এর একটি শাশ্বত রূপ আছে তা হলো, দেশের জনগণের স্বার্থ নিশ্চিত করা। উদাহরণ হিসাবে ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে সে দেশের জনগণের জন্য অর্থনৈতিক স্বার্থ যেমন রাজনৈতিকভাবে অগ্রগণ্যতা পাচ্ছে, ঠিক সেভাবেই জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি গণস্বার্থ রক্ষণে রাজনৈতিক পরিকল্পনায় শীর্ষে রয়েছে ইসরাইলীদের জন্যে। এ মুহূর্তে যদি আমরা বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনা করি তবে দেখবো, দেশটিকে তিন দিক থেকে পরিবেষ্টিত করে রয়েছে বিশ্বমানের সামরিক শক্তিধর একটি দেশ। দক্ষিণে সমুদ্র। তারও দু'শ মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল বাদ দিলে তাতেও তাদেরই একান্ত কর্তৃত্ব। পূর্বের দেশটি বিপদে এগিয়ে আসবে এমন আশা না করাই ভালো। উত্তরের মহাশক্তিমান দেশটি যদিও বা সংকটকালে পাশে দাঁড়াতে পারতো তাও রয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়ের ব্যবধানে। অতএব বাংলাদেশ ও তার জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে যৌক্তিক বিবেচনায় ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে দেশের ভূখণ্ডগত নিরাপত্তার বিষয়টি যে রাজনীতির পরিকল্পনায় শীর্ষে স্থান পাবে এতে বোধ করি দ্বিমতের অবকাশ নেই। এই মৌলিক বিষয়টিকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো বিষয়কে রাজনৈতিক পরিকল্পনার শীর্ষে স্থান দিলে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক মূল প্রতিপাদ্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবার কারণে তা দেশ ও জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সক্ষম তো হবেই না ; বরং এতে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা থেকেই যাবে।

ভূ-রাজনৈতিক বিষয়টিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে একটি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর অবকাঠামো, বিন্যাস, আকার ও আদল সম্বন্ধে একটি দিক নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব। কারণ দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে প্রতিবেশী দেশসমূহের

www.pathagar.com

সীমারেখাজনিত আন্তঃসম্পর্ক ঐ দেশের ভূখণ্ডগত প্রতিরক্ষার দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এই বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে দেশের Defence need ও forces goal সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে, যা স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ ও কার্যকরী প্রতিরক্ষার জন্য একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। যেমন দু'শ মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল বাদ দিলে বঙ্গোপসাগরের সম্পূর্ণটিই প্রতিবেশী দেশের নিয়ন্ত্রণে। অতএব আমাদের জন্য Sea Control এর চেয়ে Sea denial কৌশলগত দিক দিয়ে অধিক সঙ্গত। অতএব, বাংলাদেশের তটসীমা ও অর্থনৈতিক অঞ্চলকে যত্ন সহকারে বিচার-বিবেচনা করলে দেশের জন্য উপযোগী একটি Naval force-এর আকার ও আদল নির্ধারণ করা এমন কঠিন কিছু নয়। এই একই সূত্র সেনা ও বিমান বাহিনীর জন্যও সমভাবে প্রয়োগযোগ্য।

যথাশাব্দিক অর্থে এভাবে বলা যায়, ভূমি ও রাজনীতি এ দুয়ের সমন্বয়ে ভূ-রাজনীতি। এককভাবে ভূমি ও রাজনীতি কোনোটাই ভূ-রাজনীতি নয়। অতএব ভূমির সামরিক কৌশলগত দিক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সামরিক বাহিনী এবং দেশের রাজনীতির সাথে জড়িত রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন নাগরিক এই উভয় সমষ্টিকে একে অপরের সম্পূরক হিসেবে এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিযয়ে একে অন্যের সাথে আন্তঃযোগাযোগ ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে অবশ্যই একটি চিন্তা ও চেতনার ঐকমত্যে উপনীত হতে হবে। আর এভাবেই কেবল দেশের ভূ-রাজনীতির সঠিক মূল্যায়ন সাপেক্ষে জাতির সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে সঠিক রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামরিক শক্তি

নিরাপত্তার কথা যখন বলা হয় তখন তা নিশ্চিত করার বিষয়টিও আপনা আপনিই চলে আসে। যেখানে নিরাপত্তা আছে ধরে নিতে হবে সেটা নিশ্চিত করার সংস্থাও সেখানে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উপস্থিত, যার প্রভাবে একটি ইতিবাচক পরিবেশ বিরাজমান থাকে। যে পরিকল্পনায় নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তার নিশ্চয়তা বিধানের উপযুক্ত কোনো সংস্থা নেই, ঐ নিরাপত্তার বাস্তব সম্মত উপযোগিতা আছে বলে মনে হয় না। একটি জাতির ভূখণ্ডগত নিরাপত্তার মতো অর্থনৈতিক স্বার্থও দেশের রাজনৈতিক পরিকল্পনায় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে। এই অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিধি, অভ্যন্তরীণ, আন্তঃদেশীয়, আন্তঃমহাদেশীয় কিংবা বিশ্বব্যাপী হতে পারে। স্বার্থের পরিধি যাইহোক তা যখন দেশের রাজনৈতিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তাকে ক্ষেত্র বিশেষে বাস্তবায়ন করতে হলে ঐ পরিকল্পনার বিপরীতে শক্তি থাকা একান্ত অপরিহার্য। কারণ তা না হলে পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থাকবে, কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। আর এই পরিকল্পনা ও শক্তির আন্তঃসম্পর্ককেই বলা হয়, Force to Policy

www.pathagar.com

ratio অর্থাৎ যে দেশের পরিকল্পনা যত ব্যাপক তার সম্পূরক শক্তিও পরিমাণে তত বেশি। আর এই শক্তিই হলো সামরিক শক্তি।

মজার ব্যাপার হলো, প্রত্যেক দেশ তার জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। তবে এক দেশের স্বার্থ অন্য দেশের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হবে এমন সব সময় নাও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে যে দেশের অবস্থান স্বার্থের অনুকূলে সে দেশ চাইবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে অন্য দেশটির উপর তা বাস্তবায়ন করতে। অপর দিকে প্রতিকূলের দেশটি নিজ দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে ঐ দেশটির স্বার্থ সংবলিত দাবিকে অবশ্যই নস্যাত করতে চেষ্টা করবে। কারণ এই প্রত্যাখানের মাঝেই তার দেশের জাতীয় স্বার্থ নিহিত। এই যখন দেশটির জাতীয় রাজনৈতিক পরিকল্পনা, তখন সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শক্তি অর্থাৎ Force to Policy যা সেই দেশটিকে একটি অবস্থানে থেকে বিদেশী স্বার্থের বিরুদ্ধে 'না' বলতে সামর্থ্য যোগাবে।

সামরিক শক্তি ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি Force to Policy–র বিকল্প হতে পারে এমন মনে হয় না। কারণ সামরিক শক্তি দ্বারাই কেবল রাজনৈতিক ভারসাম্যতাকে প্রভাবিত করা সম্ভব। আর এই ভাবেই একটি দেশ অপর দেশের প্রায় সমান্তরাল অবস্থানে এসে জাতীয় স্বার্থ বাস্তবায়নে একে অপরের সাথে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক অথবা বহু পাক্ষিক বিষয়ে দর–কষাকষি করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়ন, বাজার আয়ত্তকরণ, রাজনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপন ও বিশ্ব জনমতের আনুকূল্য অর্জন প্রভৃতি। জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থে নিরাপত্তার বিষয়টিকে Force to Policy–র নিরিখে অবশ্যই সামরিক গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ পরিকল্পনার পশ্চাতে শক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিয়ামক। আর এই অতি প্রয়োজনীয় ও অপ্রতিরোধ্য নিয়ামকটি হলো দেশের সামরিক বাহিনী। তাই জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিতকরণে দেশের সামরিক শক্তি ও রাজনীতি আজ একে অপরের সম্পূরক— একথা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

জাতীয় নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনী

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেখানে নিরাপত্তার বিষয়টি আছে সেখানে তা নিশ্চিত করার সংস্থাও প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উপস্থিত ; ঐ নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ রক্ষা করার জন্য। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতির ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যায়। যেমন—দেশের ভূখণ্ডগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনীর শারীরিক উপস্থিতি একটি প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। অপরদিকে সামরিক শক্তি দেশের সীমা রেখার বাইরে ক্ষেত্র বিশেষে আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আন্তঃমহাদেশীয়, এমনকি বিশ্বব্যাপী একটি দেশের নিরাপত্তাজনিত জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। এই শক্তি

www.pathagar.com

পরোক্ষভাবে বিদ্যমান, যার উপস্থিতি অন্যান্য দেশ প্রত্যক্ষ শক্তির মতোই উপলব্ধি করে। আর এই পরোক্ষ শক্তি বহির্বিশ্বে স্বাগতিক দেশটির পররাষ্ট্র ও কূটনীতির সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। অতএব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিরাপত্তা জনিত জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে হলে দেশের জন্য একটি দক্ষ সামরিক বাহিনী ও কার্যকরী সামরিক শক্তির অধিকারী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ সামরিক শক্তির একটি দেশ যেমন প্রভাবশালী, তেমনি তার ইচ্ছা ও অনিচ্ছার প্রতি সবাই সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

যখন দেশের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সামগ্রিক ও জাতীয়ভাবে নিশ্চিত করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তখন এই মহাপরিকল্পনার সাথে সামরিক বাহিনী ও দেশের জনগণকে সম্পৃক্ত করাটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ একটি দেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, জাতির গৌরবময় সামরিক অতীত ও বর্তমান ইতিহাস, ধর্ম বিশ্বাস, জাতীয় মনন ও জাতিগত সংবদ্ধতা সমরবিদদের জন্য শান্তিকালীন ও যুদ্ধাবস্থায় নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদানে মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। অতএব দেশের জনগণ ও সামরিক বাহিনীকে দেশের নিরাপত্তা বিধানে একে অপরের সম্পূরক হিসেবে চিন্তা ও চেতনার ঐকমত্যে অবশ্যই উপনীত হতে হবে। তা না হলে সামগ্রিকভাবে দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ এককভাবে দেশের জনগণ অথবা সামরিক বাহিনী কোনোপক্ষই এক্ষেত্রে Force to Policy-র মাত্রাগত যথেষ্টতার সম্পূরক শক্তি নয়। ফলে এই অপূর্ণ শক্তি দ্বারা জাতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনাকে সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়িত করা প্রায় অসম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন দেশের মাটি, মানুষ ও সামরিক বাহিনীর ইস্পাত দৃঢ় মহাশক্তি ও ঐক্যের।

উপসংহার

বাংলাদেশের জন্য একটি সামরিক পরিকল্পনার সন্ধান করতে গিয়ে এতে যে সামরিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিকে সন্নিবেশিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে—সামরিক শিক্ষা, ভূ-রাজনৈতিক বিষয় ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব। জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে এ বিষয়সমূহকে দেশবাসীর সামনে একটি সমন্বিত সামরিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তুলে ধরা অধিক সমীচীন মনে হয়েছে। যাতে দেশের জনগণ ও সামরিক বাহিনীর মাঝে এ বিষয়ে চিন্তা ও চেতনার ঐক্য প্রতিষ্ঠা সাপেক্ষে দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের চিন্তাধারাকে একটি ইতিবাচক দিকে প্রবাহিত করা সম্ভব হয়। আর এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া যত দ্রুত আরম্ভ করা যায়, দেশ ও জাতির জন্য ততই মঙ্গল।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

একটি রণকৌশলের সন্ধানে

রণকৌশল শাশ্বত। যেদিন থেকে পৃথিবীতে যুদ্ধের শুরু, সেদিন থেকে রণকৌশলের জন্ম। অতএব যুদ্ধ যেমন আছে তেমনি তা জেতার কৌশলও সেভাবেই বর্তমান। অতএব, এই কৌশলের নির্ধারণ ও নির্বাচনের গুরুত্ব অতীতে বোধকরি যেমন ছিলো বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও যে তা থাকবে, তাতে সন্দেহের বড় একটা অবকাশও নাই। যে কোনো যুদ্ধে একের অধিক পক্ষ থাকে। সব পক্ষের উদ্দেশ্য একটাই—জয়লাভ করা। আর এখানেই নিহিত রয়েছে রণকৌশলের মর্মবাণী। কিভাবে একটি দেশ যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করবে—যেমন নির্দেশ করে রণকৌশলের নির্ধারণকে, তেমনি কোথায় এবং কি প্রকারে শত্রুকে ঘায়েল করা যাবে, বিষয়টি সম্পৃক্ত রয়েছে রণকৌশলের নির্বাচনের সাথে। সুতরাং একথা প্রতিভাত হচ্ছে যে, একই যুদ্ধে প্রত্যেক পক্ষের তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রণকৌশলের নির্ধারণ ও নির্বাচন যুদ্ধ জয়ের জন্য অবশ্যই ভিন্নতর হবে। সন্দেহ নেই যুদ্ধরত পক্ষগুলির মধ্যে যার রণকৌশলের নির্ধারণ ও নির্বাচন চাতুর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হবে, সেই জয়লাভ করবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়--'ক্ষেত্র বিশেষে এক ফোটা তৈলে অনেক কাজ হয়, আবার কলসি কলসি ঢালিলেও কোনো কাজ হয় না।' অর্থাৎ শত্রুর কৌশলের বিরুদ্ধে নিজের কৌশল চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে নির্বাচন ও ক্ষেত্র বিশেষে সময়মতো প্রয়োগ করলেই কেবল জয়লাভ করা সম্ভব, অন্যথায় নয়। এই 'ক্ষেত্র' কথাটির সাথে কোথায় বর্তমানে যুদ্ধ হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হতে পারে তা জড়িত। আর এই মৌলিক বিষয়টির সাথে মিশে রয়েছে ভূমি ও প্রকৃতি। অতএব দেখা যাচ্ছে রণকৌশল নির্ধারিত হবে ভূ-প্রকৃতির নিরিখে। অর্থাৎ দেশের ভূ-প্রকৃতি যেভাবে দিক নির্দেশনা দেবে ঠিক সেভাবেই একটি দেশের সেনানায়করা যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রয়োগের নিমিত্তে তাদের বাহিনীর জন্য রণকৌশল নির্ধারণ ও নির্বাচন করবেন, শত্রুর রণকৌশলের আদলে নয়। যেহেতু প্রত্যেক দেশের ভূ-প্রকৃতি ভিন্নতর, তাই তাদের রণকৌশলের নির্ধারণ ও নির্বাচন এবং ক্ষেত্র বিশেষে তার প্রয়োগ যে অন্য সব দেশ হতে আলাদা হবে এটাই যুক্তিযুক্ত। কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় দেশের জন্য যুৎসই একটি রণকৌশলের ধারণা বিনির্মাণ করা যায়, এমন একটি অনুসন্ধান প্রয়াস নিবেদিত হলো।

www.pathagar.com

রণকৌশল নির্ধারণ

যেহেতু যুদ্ধরত প্রত্যেক পক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে যে কোনো প্রকারে পরাজিত করে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কিভাবে তা সম্ভব হবে? এই 'কিভাবে' বিষয়টিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে তা এমন এক পদ্ধতির দিক নির্দেশনা দেবে যা চাতুর্যের ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সময়মতো শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলে জয় নিশ্চিত করবে। আর এই অনুপম পদ্ধতিটিই হচ্ছে রণকৌশল। এখন কথা হচ্ছে, কিভাবে এই অতি প্রয়োজনীয় যুদ্ধ জয়ের অমোঘ কৌশলটিকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। একটি দেশের জন্য তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী রণকৌশল নির্ধারণের সময় সে দেশের সম্ভাবনাকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে—যার মধ্যে রয়েছে ঐ দেশের ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, গৌরবময় সামরিক অতীত ও বর্তমান ইতিহাস, জাতীয় সংবদ্ধতা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাতীয় মনন প্রভৃতি। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে বিশদভাবে বিচার বিবেচনা করলে তা থেকে উৎসারিত ইঙ্গিতসমূহ এমন সব অভিনব ও অনুপম যুদ্ধ কৌশলের ধারণার জন্ম দেবে, যার উৎসমূলে রইবে দেশটির মাটি ও মানুষ এবং ভূ-প্রকৃতির সাথে মানানসই সমর সম্ভার ও সমর কৌশল। এই সম্পৃক্তকরণের কাজটি সম্পন্ন হবে দেশের সমরবিদ ও রাজনীতিক উভয় সমষ্টির যৌথ কর্মকাণ্ডের দ্বারা। এক্ষেত্রে আরো যে বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে তা হচ্ছে, দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা। একটি দেশ তার আর্থ সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নিজ নিজ দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। যদি ঐ দেশটি নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী বাহিনীর ব্যয়ভার বহনে সক্ষম না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ কৌশলের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করে স্থায়ী বাহিনীর আকার ছোট রেখেও স্বল্প ব্যয়ে নিরাপত্তার দাবি মেটানো সম্ভব। এর জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা।

রণকৌশল নির্বাচন

'আল হারব খেদাউন' (অর্থ—যুদ্ধ হচ্ছে ধোঁকাবাজি)—আল হাদিস। অথবা 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'—ভারতীয় প্রবাদ। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ উক্তিদ্বয় রণকৌশলের দুটি মৌলিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করছে। প্রথমটি ডিসেপশন বা ধোঁকাবাজি, দ্বিতীয়টি কৌশল। অর্থাৎ এই উভয় নির্দেশনা দুটিকে একীভূত করে যদি এভাবে বলা যায় যে, যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করতে অভিনব সব যুদ্ধ কৌশল নির্বাচন করতে হবে যা শত্রুকে এমনভাবে ধোঁকায় নিপতিত করবে যে সৈন্য ও সমর সম্ভারে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও প্রবল প্রতিপক্ষ দুর্বল পক্ষের নিকট চরমভাবে পরাজিত হবে। যুদ্ধের দুর্বল পক্ষ তার শক্তিমান প্রতিপক্ষের শ্রেষ্ঠত্বকে অকার্যকর করে যুদ্ধের মাঠে নিজের দুর্বল অবস্থানকে

www.pathagar.com

প্রবলতর করতে পারবে যদি সে অভিনব যুদ্ধকৌশলের দ্বারা প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে গোলক ধাঁধায় ফেলে দিতে সক্ষম হয়। যৌক্তিক বিবেচনায় দুর্বল পক্ষের জন্য প্রবল পক্ষের শক্তি শ্রেষ্ঠত্বকে অতিক্রম করবার এটাই বাস্তবসম্মত পন্থা। কারণ সবলের সাথে দুর্বলের অসম সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হবার কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

রণকৌশল নির্বাচনের সময় অন্য যে বিষয়টিকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে তা হচ্ছে, নিজের রণকৌশল যেন প্রতিপক্ষের রণকৌশলের মতো না হয়। কারণ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ উভয়ের কৌশল যদি একই হয় তবে যত চাতুর্যের সাথেই এই কৌশলকে অন্যের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হোক না কেন, এক্ষেত্রে জয় শেষ অবধি তারই হবে যার সমর সম্ভার ও সৈন্য সংখ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অতএব রণকৌশলের নির্বাচন একটি দেশের কৌশলগত সীমাবদ্ধতাসমূহকে এমনভাবে সমাধানের ইঙ্গিত যেন প্রদান করে যা ঐ দুর্বল দেশটিকে তার প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে টিকে থাকতে ও শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে নিশ্চিতভাবে সহায়তা করবে।

কৌশলগত সীমাবদ্ধতা

১. গভীরতা

যে সকল দেশের আয়তন ছোট হবার কারণে গভীরতা কম তাদের কৌশলগত দিক থেকে অসুবিধাজনক—এই সমস্যাটির বোধ করি দুটো বাস্তবসম্মত সমাধান রয়েছে। এক. একই ভূমি সীমার অংশীদার কোনো প্রতিবেশী দেশের সাথে মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধকালে ঐ দেশের ভূমি ব্যবহারের সম্মতি অর্জনের দ্বারা, দুই. নিজ দেশেই এমন এক চলমান আক্রমণাত্মক রণকৌশল নির্বাচন ও অবলম্বন করা যাতে শত্রুর সাথে 'ডিসাইসিব এংগেজমেন্ট' এড়িয়ে দেশের ভিতরে শত্রুকে মাল্টিপল ফ্রন্টে একটি দীর্ঘমেয়াদি চলমান যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা এবং একই সাথে যুদ্ধের পরিধিকে আক্রমণকারী শত্রু দেশের অভ্যন্তরে সম্প্রসারিত করা। এই কৌশলের দ্বারা সীমিত আয়তনের মধ্যে সীমাহীন গভীরতা যেমন অর্জন করা যাবে, তেমনি একাধিক ফ্রন্টে চলমান যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার কারণে শত্রু কোনো বিশেষ ফ্রন্টে 'ডিসাইসিব কনসেনট্রেশন অব ফোর্স' করতে না পারার কারণে তার পক্ষে ভূমির দখল দীর্ঘমেয়াদি করা সম্ভব হবে না।

পক্ষান্তরে শত্রুকে একাধিক ফ্রন্টে নিয়োজিত হতে বাধ্য করার মাধ্যমে তার শক্তিকে ন্যূনতম পর্যায় পর্যন্ত বিভাজিত করা যাবে। ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনায় 'লোকাল সুপিরিয়রিটি অব ফোর্স' অর্জন সহজ হবে। এতে করে একদিকে আক্রমণে শত্রুশক্তিকে যেমন ক্ষয় করা যাবে তেমনি স্থানীয়ভাবে অর্জিত সাফল্যসমূহ নিজ বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে, যার মূল অপরিসীম। চলমান যুদ্ধ

www.pathagar.com

কৌশলের দ্বারা একটি স্বল্প আয়তনের দেশে কি করে সীমাহীন গভীরতা অর্জন করা যায় তার উদাহরণ এইরূপ। যেমন—বেগুনি, নীল, সাদা, কাল, সবুজ, হলুদ ও লাল এই কয়টি রং-এর সমাহার ঘটিয়ে সীমাহীন রংয়ের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা সম্ভব। একটি দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তের সোজা পথের শত কিলোমিটারের দূরত্বকে আঁকা বাঁকা রাস্তা তৈরির মাধ্যমে হাজার হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে। চলমান রণকৌশল অবলম্বনে দেশের সীমিত গভীরতাকে এভাবেই সীমাহীন ভাবে বর্ধিত করা যায়। এটা ঠিক, একটি সীমিত বৃত্তের মধ্যে অনন্তকাল ধরে চলার মতো অবস্থা।

২. যুদ্ধের সম্প্রসারণ

শত্রু দেশের ভিতরে যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে যে সুবিধাগুলো অর্জিত হবে তা হচ্ছে— এক. এটা দেশের গভীরতায় বৃদ্ধি ঘটাবে, দুই. যুদ্ধের এই সম্প্রসারণ একদিকে নিজ বাহিনীর মনোবল যেমন বৃদ্ধি করবে অপর দিকে শত্রুর মনোবলে হানবে চরম আঘাত। তদুপরি নিজ বাহিনী দ্বারা শত্রুর দেশের অভ্যন্তরে মোক্ষম কোনো লক্ষ্যবস্তুর দখল আক্রমণকারী শত্রুর সাথে দর-কষাকষির মূল্যবান উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। ক্ষেত্র বিশেষে তা যুদ্ধের যবনিকাপাতও ঘটাতে পারে। এর বহু নজির অতীতের মতো বর্তমানেও মজুদ রয়েছে।

৩. পর্যায়

একটি ক্ষুদ্র দেশ বৃহৎ শক্তির মোকাবেলায় শুরুতেই চলমান যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করবে, না সে তার যুদ্ধ কৌশল ধ্রুপদী যুদ্ধের সনাতনী রণকৌশলে একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত সীমিত রাখবে—তা নির্ভর করে দেশটির ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও সে দেশের সামরিক সম্ভাবনার উপরে। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুটির গভীর অন্তর্দৃষ্টিসহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও চুলচেরা বিবেচনা একটি যুৎসই রণকৌশলের ধারণা বিনির্মাণে মুখ্য ভূমিকা রাখবে, যাতে দেশের মাটি ও মানুষের মহাশক্তির সাথে সমন্বিত হবে নিজস্ব সামরিক সূত্র ও সমর কৌশল।

উপসংহার

একটি দেশ আক্রান্ত হলে কিভাবে শত্রুকে মোকাবেলা করবে তা জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছোট, বড়, শক্তিধর, দুর্বল-সবার জন্য বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। অতএব এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে যথাযথভাবে আমলে নেওয়ার জন্য প্রত্যেক জাতির সামর্থ অনুযায়ী যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যুদ্ধের জন্য জাতিকে তৈরি করার মতো বিশাল কর্মকাণ্ডটি ভুল-নীতি অনুসরণের ফলশ্রুতিতে আখেরে যেন

www.pathagar.com

ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয় সে ব্যাপারে সমরবিদদের সাথে রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকদের সম্পৃক্ত হওয়া অতীব জরুরি। কারণ এই উভয় সমষ্টি দেশের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক সম্ভাবনার বিষয়গুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ একটি মানানসই রণকৌশল নির্ধারণ ও নির্বাচন করবেন, যার সফল প্রয়োগ বিজয় নিশ্চিত করবে।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

রণকৌশলগত সমস্যা সমাধান : একটি পর্যালোচনা

আরম্ভের যেমন প্রারম্ভ আছে, যা সম্পন্ন হয় আরম্ভের পূর্বে তেমনি রণকৌশলগত সমস্যারও একটি প্রারম্ভ আছে, যার সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই সম্যক ধারণা না নিলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। রণকৌশল বা ট্যাকটিক্স সম্বন্ধে অনেকে বিচিত্র রকম ধারণা পোষণ করেন। কারো কারো মতে এটি একটি পারদ সদৃশ তরল পদার্থের মতো, যা পাত্র অনুযায়ী আকার ধারণ করে। সত্যি কি রণকৌশল তাই? একে কি ইচ্ছে মতো ব্যবহার করে রণকৌশলগত সমস্যা সমাধান করা যায়? বা আদৌ কি তা সমীচীন? এ সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আরো যে কাজটি নিরসনের দাবি রাখে তা হচ্ছে, কোর্স। তা, সে যে পর্যায়েরই হোক না কেন তাতে কি পরিমাণ রণকৌশল জানা ও শেখা যায়? তা অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। কারণ, জানা এবং শেখার মাঝে একটা বড় ফারাক রয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে এ বিষয়ে স্বল্প পরিসরে একটি নিরীক্ষাধর্মী আলোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে, যাতে রণকৌশলের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে রণকৌশলগত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মতদ্বৈধ ও বিচিত্রধর্মী সংজ্ঞায়নের অবসান হয়।

রণকৌশল কি?

ক্লজউইৎজ-এর মতে, রণকৌশল বলতে সৈন্য পরিচালনার সূত্রকে বুঝায়। অন্য সমরবিদরা যুদ্ধে অস্ত্রের ব্যবহারকেই রণকৌশল বলেছেন। ক্লজউইৎজ এর সূত্র বিশ্লেষণ করলে প্রতিভাত হয় যে, তিনি সৈন্যবাহিনী বলতে ফাইটিং ফোর্স বুঝিয়েছেন যা ব্যাপক অর্থে আর্মি, নেভী এবং এয়ার ফোর্সকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে আরো যে বিষয়টি দেখার মতো তা হচ্ছে, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা সামগ্রিকভাবে রণকৌশলের পর্যায়ে নাও পড়তে পারে, যেমন কম্বেটজোনের মাঝে সৈন্য পরিচালনা ম্যানুভার পর্যায়ভুক্ত। আবার কোনো শত্রু বাহিনীর নিকটবর্তী হবার জন্য সেনাবাহিনী পরিচালনাকে এ্যান্টিসিপেটেড মার্চ বলে। তবে এই বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ সৈন্যবাহিনী যখন কোনো পাহাড়, নদী কিংবা জঙ্গল অতিক্রম করে তখন তা রণকৌশলের পর্যায়ভুক্ত হয়। কারণ, এতে কিছু বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হয়। মোট কথা হচ্ছে এখানে সৈন্য পরিচালনা বলতে 'মেজর অপস্ অব ওয়ার' বা অগ্রাভিযান, প্রতিরক্ষা, আক্রমণ

www.pathagar.com

ও রণকৌশলগত পুনঃঅবস্থান গ্রহণে সৈন্য পরিচালনাকে তিনি রণকৌশল পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এই পর্যায়ভুক্ত করণের পেছনে যে কারণ ক্রিয়াশীল তা মুখ্যত এই যে, কম্বেটের প্রতিটি এলিমেন্ট শত্রু বাহিনীর কাঠামোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে যা সে বিরুদ্ধ বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য যে কোনো সময় ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নিজ বাহিনী যখন প্রতিরক্ষায় থাকবে শত্রু বাহিনী তখন আক্রমণে যাবে। আবার যখন শত্রুবাহিনী পশ্চাদপসারণ বা রণকৌশলগত পুনঃঅবস্থান গ্রহণে তৎপর হবে, তখন নিজ বাহিনী তাদের অগ্রাভিযান করবে। অতএব দেখা যাচ্ছে সৈন্য পরিচালনা যেহেতু শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়, তাই রণকৌশলগত দিক দিয়ে তা মুখ্যত এই চারটি মেজর অপস্ অব ওয়ারের মধ্যে অবশ্যই সীমিত থাকবে। কারণ নিজ বাহিনীর বিরুদ্ধে শত্রু বাহিনীর প্রতিক্রিয়া এবং শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজ বাহিনীর প্রতিক্রিয়া মুখ্যত এই চারটি মেজর অপস্ অব ওয়ারের মধ্য দিয়েই রণকৌশলগত ভাবে পরিব্যক্ত হয়ে থাকে। এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি রণকৌশলের সহগামী হিসেবে বিবেচিত হয়, তার প্রেক্ষিত যাই হোক না কেন।

অন্যান্য সমরবিদদের সূত্রে রণকৌশলের মৌলিক বিষয় প্রতিভাত হয়। এতে দৃশ্যত পদাতিক বাহিনীর সৈন্য এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরো একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হবে যে, এক্ষেত্রে অস্ত্র নয় ; বরং অস্ত্র হতে নির্গত ফায়ার সমন্বয়ই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। এই ফায়ার সমন্বয় যখন পদাতিক বাহিনীর সৈন্য এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ক্ষেত্রে হয় তখন তা হয় 'মাইনর ট্যাকটিকস' এবং যখন তা পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনীর ফায়ার সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত করে সে সময় তা হয় 'মেজর ট্যাকটিকস'। তবে যেহেতু ফায়ার সমন্বয়ের সাথে সৈন্য পরিচালনার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটাকে বাদ দিয়ে অপরটি কল্পনা করা যায় না, সেহেতু ফায়ার সমন্বয়সহ সৈন্য পরিচালনার সূত্রকেই রণকৌশল বলে।

রণকৌশল আত্মস্থকরণ

রণকৌশল কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে সম্যক ও সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করা যায়, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে বৈকি। যদি জানা এবং শেখা এ দুটোকে আলাদা ভাবে চিন্তা করা হয়, তবে জানার অংশটি সম্পূর্ণ হয় রণকৌশল সম্বন্ধীয় কোর্সে অংশগ্রহণ ও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত অধ্যয়নের দ্বারা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শল্যবিদ না হয়েও একজন ব্যক্তিগত অধ্যয়নের দ্বারা ঐ বিষয়ে অনেক কিছুই জানতে পারে, তবে কেবল জানার জ্ঞান দিয়ে তার পক্ষে শল্যবিদ হওয়া সম্ভব নয়, প্রশ্ন হতে পারে, কোর্সেও তো সীমিত আকারে অনুশীলন হয়। এর জবাবে বলা যায়

www.pathagar.com

যে, জানার জ্ঞানকে বাস্তবে অনুশীলনের মাধ্যমে কিভাবে শেখার রূপান্তরিত করে ক্রমান্বয়ে সেই জ্ঞান আত্মস্থ করা যায় এটা তারই একটি নিরীক্ষাধর্মী দিক নির্দেশনা মাত্র। কোর্স, তা সে যে পর্যায়েরই হোক না কেন এর অন্তর্নিহিত মূল বক্তব্য এটাই। অতএব কোর্সে জানা যায়, আত্মস্থকরণ হয় না। এবার শেখার বিষয়টির প্রতি একটু গভীরভাবে নজর দিলে এর মাঝে অনুশীলনের ব্যাপারটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখা যাবে। অর্থাৎ যা জানা গেল, অনুশীলনের মাধ্যমে বাস্তব প্রয়োগ করে তার কার্যকারিতা শেখা হলো। এ আরম্ভ ন্যূনতম স্তর হতে অবশ্যই হতে হবে, যাতে করে তার মাঝে রণকৌশলের বাস্তব ভিত্তিক প্রাথমিক জ্ঞানের ভিত্তি রচিত হয়, যার উপরে নির্ভর করে সে ঐ বিষয়ে ভবিষ্যত উচ্চতর জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। রণকৌশলগত জ্ঞানকে আত্মস্থ করতে হলে এটাকে এমন একটি প্রশিক্ষণের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, যা দৈনন্দিন জীবনে একটি অভ্যাসে পরিণত হয়, যাতে করে সে দায়িত্ব সমাধানের সাথে নিজের পারদর্শিতার মান ও প্রতিক্রিয়া যাঁচাই করতে পারে। এই প্রশিক্ষণের পদ্ধতিটি হবে জানা এবং শেখার সমন্বয়ে রচিত দীর্ঘপ্রসারী নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণের একটি অংশ, ফলে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা যেন সম্ভব হয়। তা না হলে দুর্বল ভিত্তির উপরে অর্জিত অপরিপক্ক জ্ঞান যুদ্ধক্ষেত্রে রণকৌশলগত সমস্যা সমাধানে মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে।

প্রশিক্ষণের ধারা

রণকৌশলগত প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পারদর্শিতার সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য ও অস্ত্রকে ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন। একটি সফল প্রশিক্ষণ বলতে যে কেবল ঐ বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা আত্মস্থকরণকে বুঝায় তাই নয়, এতে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে নিয়মিত অনুশীলন ও রিহার্সাল, যা অবশ্যই একটি দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হবে। অতএব, প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিনিয়ত পুনঃপ্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও রিহার্সাল। এই ত্রিবিধ বিষয়বিহীন অর্জিত জ্ঞান জানার পর্যায়ে পড়ে, যার দ্বারা ঐ বিষয়ে দক্ষতা ও পারদর্শিতা লাভ প্রায় অসম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একজন বৈমানিক নিয়মিত উড্ডয়নের অনুশীলন না করলে তার পক্ষে লক্ষ্যভেদ পারদর্শিতা অর্জন দূরে থাক, সফল উড্ডয়নের দক্ষতা লাভ করা সম্ভব নয়।

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা

আমাদের সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা একই সাথে পাশাপাশি দেয়া হয়। আপাত দৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মর্ম একই মনে হতে পারে। কারণ উভয়ের উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষার্থীকে বিশেষ ধাঁচে গড়ে তোলা। কিন্তু শিক্ষা প্রদানের একাডেমিক ডিসিপ্লিন এবং

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ প্রদানের কাঠামো, বিধি ও নীতি বিবেচনায় নিলে উভয়ের মধ্যে একটা তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তা মূলত অনুকরণ, পুনঃপুনঃকরণ অথবা অনুশীলন যাতে চিন্তাভাবনা করার বড় একটা অবকাশ থাকে না। এতে যে পদ্ধতি বা বিধি ব্যবহৃত হয় তাতে পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের অবকাশ নেই বললেই চলে। যেমন ড্রিল অনুশীলনকরণ বা বেতার যন্ত্রে কথোপকথন পদ্ধতি কিংবা কোনো একটি যন্ত্র চালনা করার ধারাবাহিকতা ইত্যাদি। যদিও প্রশিক্ষণের পরিধি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড়ও হতে পারে তবে এর মূল উদ্দেশ্যই হবে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞানের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ। প্রশিক্ষণ প্রদানের পেছনে যে মর্মবাণী ক্রিয়াশীল তা হচ্ছে 'বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন'। এই মান অর্জন তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন একজন শিক্ষার্থী শিক্ষার একটি বিশেষ স্তরে উপনীত হয় যেখানে এসে ঐ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয় এবং সে তাতে পারদর্শিতা লাভ করে।

অতএব একজন শিক্ষার্থী তখনই দক্ষ হয়েছে বলা যাবে, যখন বিশেষ পরিস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত পারঙ্গমতাসহ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সে সক্ষম হবে বা ঐ পরিস্থিতিতে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারবে। যেমন একটি পেট্রোল পার্টি কিংবা একটি কোম্পানি শত্রু দ্বারা এ্যাম্বুশে আক্রান্ত হলে কমান্ডার তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে কাউন্টার এ্যাম্বুশ ড্রিল অনুসরণ দ্বারা নিজের সৈন্য দলকে যদি শত্রুর বেষ্টনী মুক্ত করতে পারে, তবে বুঝতে হবে সে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এতে শত্রুর ক্ষতি যত বেশি এবং নিজের ক্ষতি যত কম হবে প্রশিক্ষণে তত বেশি পারদর্শিতা অর্জিত হয়েছে বলা যায়।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীর মধ্যে মূল্যবোধের জন্ম দেয়া। তার মানসিক, আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধন করা। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয়। পি. এইচ. হার্সস্ট-এর মতে—শিক্ষা হচ্ছে এক ধরনের তথ্যগত জ্ঞান যা মূলত শিক্ষার্থীর মাঝে ধারণার জন্ম দেয়, যেটি একটি একাডেমিক ডিসিপ্লিনের মাধ্যমে দিতে হবে। অতএব প্রশিক্ষণের মতো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু না শিখেও একজন শিক্ষার্থী সুশিক্ষিত হয়েছে বলা যায়। উপসংহারে বলা যায় যে, প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের বা কাজ করার জন্য দক্ষ করে গড়ে তোলা। অন্যদিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ নিশ্চিত করা। এটা সম্ভবত এ জন্যে যে, পেশাগত উঁচুমানের জ্ঞান অর্জনের জন্যে তাকে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় ভাবে প্রস্তুত করা। সামরিক পরিমণ্ডলে পেশাগত সামাজিকতার উৎকর্ষ সাধন করা যাতে একজন ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে দলগত স্বার্থে নিজেকে সংযুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হয়। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হবার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক নীতিমালার মধ্যে সে যেন নিজেকে স্বনিয়ন্ত্রিতভাবে

www.pathagar.com

উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়। এই প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিশেষ করে প্রশিক্ষণ একজন ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে তার চেতন মনে গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণের তথ্যগত ও অনুশীলনিক পর্ব সম্পন্ন হয়ে ঐ প্রশিক্ষণ যখন সমাপ্ত হয়, তখন তা অবচেতন মনে সংরক্ষণের জন্য প্রকৃতিগতভাবে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর ঐ বিশেষ প্রশিক্ষণের স্বপক্ষে ঐ ব্যক্তির যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় ভাবে অবচেতন মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন একজন গাড়ি চালক সামনে গতিরোধক দেখলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার এক পা ব্রেকে চলে যাবে এবং অন্য পা এক্সেলেটর হতে আলগা হয়ে গাড়ির গতিকে ধীরলয়ে নিয়ে এসে গতিরোধক অতিক্রম করবে। এখানে চালকের তেমন চিন্তার কোনো প্রয়োজন হয় না। কারণ এক্ষেত্রে অবচেতন মনে রক্ষিত নির্দেশসমূহের স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিক্রিয়ায় গাড়িচালক নিয়ন্ত্রিত হয়। আরো স্পষ্টভাবে বললে বলা যায় যে, এক্ষেত্রে অবচেতন মন চেতন মনকে স্বাভাবিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। উল্লেখ্য যে, চেতন মন অবচেতন মনের নয় ভাগের এক ভাগ, বাকি নয় ভাগের আট ভাগই হচ্ছে অবচেতন মন। অতএব চেতন মনের উপর অবচেতন মনের নিয়ন্ত্রণ অপরিসীম। আর অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া তাতে সংরক্ষিত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য এবং নির্দেশাবলীর মধ্যে সীমিত থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। এটা ঠিক কম্পিউটারের মতো সংরক্ষিত তথ্যের উপরে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। যা তাতে সংরক্ষিত নেই সে বিষয়ে কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া আশা করা যায় না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে চেতন ও অবচেতন মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধান করতে হলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ও অনুশীলনিক পর্যাপ্ত নির্দেশাবলী চেতন মনের মাধ্যমে অবচেতন মনে সংরক্ষণ করতে হবে। কেননা কোন বিষয়ে বিচার বিবেচনা (Judgement) হচ্ছে তার চেতন মনে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং স্বজ্ঞা (Intuition) হচ্ছে তার অবচেতন মনের যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিক্রিয়া যা সামরিক সমস্যা বিশেষ করে রণকৌশলগত সমস্যা সমাধানের মূল ভিত্তি। অতঃপর রণকৌশলগত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা ও স্বজ্ঞা উভয় মাধ্যম হতে পরিপক্ক ও সফল প্রতিক্রিয়া আশা করতে হলে এই বিশেষ সামরিক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাথমিক পর্যায় হতে প্রদান করে চেতন ও অবচেতন মনকে পূর্ণভাবে সমৃদ্ধ করতে হবে। অন্যথায় অপক্ক প্রতিক্রিয়া রণকৌশলগত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

রণকৌশলের পরিধি

রণকৌশলের অভ্যন্তরীণ পরিধি দুইটি প্রধান অংশের আওতাভুক্ত। প্রথমটি আর্ট (আর্ট অব ওয়ার), দ্বিতীয়টি সায়েন্স। আর্ট অব ওয়ার বলতে ক্লজউইৎস-এর মতে যা বুঝায় তা হচ্ছে, যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রাপ্ত প্রত্যেকটি বিষয়কে কৌশলের সাথে যুদ্ধে নিয়োজিত করা।

www.pathagar.com

এই বিষয়গুলো সরাসরি এমন সব খণ্ড যুদ্ধের সাথে (Fighting) সংযুক্ত যা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। অতএব যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল প্রাথমিকভাবে খণ্ড যুদ্ধ পরিচালনার পর্যায়ে থাকে যা শেষ অবধি যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। আর যুদ্ধ হচ্ছে অনেক খণ্ড যুদ্ধের সমাহার। এই খণ্ড যুদ্ধকে যখন এককভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন তা রণকৌশলের পর্যায়ে থাকে আর যখন যৌথভাবে যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে স্ট্রাটেজি বলা হয়। যুদ্ধ হচ্ছে একটি আর্ট বা কৌশল, যার সমাধান শেষ পর্যন্ত এ্যাকশনে পরিসমাপ্তি পায়। যেমন শত্রু বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করতে হলে রণকৌশলগত ক্ষেত্রে আক্রমণ অথবা প্রতিরক্ষার মতো রণকৌশলগত এ্যাকশন বা কর্মপন্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অপর দিকে রণকৌশলের সায়েন্স বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দিকটি অন্তর্ভুক্ত করে এমন সব জটিল বিষয়, যে সম্বন্ধে অনেক জানতে হয়। এই বিষয়গুলো হচ্ছে ব্যক্তির বা সমষ্টিগত মনোবিজ্ঞান, গতিবিজ্ঞান, ভূমিবিজ্ঞান ও অস্ত্রে ব্যবহৃত ব্যালাস্টিক এর কার্যকারিতা। এই সকল বিষয়ের উপর অর্জিত প্রভূত জ্ঞানের ফলাফলের ব্যবহারের উপরেই যুদ্ধে পারদর্শিতা অর্জন নির্ভরশীল। যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিয়মিত গবেষণা ও উন্নয়নের দ্বারা যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য উন্নতমানের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও উন্নয়ন সাধন করে তা শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করেই তবে বিজয় অর্জন সম্ভব। যেহেতু আর্ট বা রণকৌশলের ক্ষেত্রে এ্যাকশনের বেলায় ভালো করতে হয়, তেমনি সায়েন্স বা বিজ্ঞানের বেলায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং এ্যাকশনের সফল সমন্বয়ই হচ্ছে যুদ্ধ জয়ের মূল চাবিকাঠি। রণকৌশলের এই যে পরিধিগত অভ্যন্তরীণ বিভাজন, আর্ট ও সায়েন্সের প্রতি একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর একটি স্বাভাবিক শ্রেণীগত বিভাজন পরিলক্ষিত হবে। আমরা যদি সেনাবাহিনীর কাঠামোগত গঠন বিবেচনায় আনি, তবে এতে যে এলিমেন্টগুলো রয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে এদের ভূমিকা আর্ট এবং সায়েন্স মুখ্যত এই দুই মূল বিভাজন দ্বারাই বিন্যস্ত। যেমন ফাইটিং আর্মস কর্মক্ষেত্রে আর্ট, সাপোর্টিং ও সার্ভিসেস সায়েন্স এর আওতাভুক্ত। কারণ ব্যালাস্টিক সিস্টেম, গতি বিজ্ঞান ও ভূমি বিজ্ঞান গোলন্দাজ এবং মিজাইলের ক্ষেত্রেই মূলত দরকারি, ক্ষুদ্রাস্ত্রের জন্য এর প্রয়োজন ততখানি নয়। যেহেতু বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান দ্বারা গবেষণা ও উন্নয়নের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নব নব আবিষ্কারের দ্বারা উন্নতমানের অস্ত্র ও প্রযুক্তির যুদ্ধক্ষেত্রে সফল ও কার্যকরী প্রয়োগের উপর আর্ট অব ওয়ারের সাফল্য নির্ভরশীল। তাই সেনাবাহিনীর কাঠামোর মাঝে নিয়োজিত এলিমেন্টসমূহকে অবশ্যই তাদের অনির্দিষ্ট সনাতন ভূমিকা আর্ট ও সায়েন্স এই দুই শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে প্লে করবার পূর্ণ সুযোগ থাকতে হবে। কারণ আধুনিক যুগ বিশেষজ্ঞদের যুগ। আর বিশেষজ্ঞ ঐ ব্যক্তি যিনি অল্প বিষয়ে বেশি জানেন। একজনকে সকল কাজের কাজী বানালে সে নিজের জন্য তো বটেই অন্যের বেলায়ও

www.pathagar.com

বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে পারে। যার যা কাজ তাকে তাই করতে দিলে কর্মক্ষেত্রে আর্ট ও সায়েন্সের কার্যকরী সফল ও উন্নয়ন পূর্ণতা লাভ করবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা

যেমনটি সূচনাতে বলা হয়েছে যে অনেকের মতে রণকৌশলের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবাধ স্বাধীনতা আছে। এক্ষেত্রে একজনের সিদ্ধান্ত আর অন্য জনের মতো সাধারণত হয় না। কারণ হিসাবে তারা বলেন যে, রণকৌশল পরিস্থিতি নির্ভর। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়। অতএব যে যেমন খুশি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এটা ঠিক। তবে অনেকে রণকৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এর প্রয়োগ করে রণকৌশলগত ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের বিষয়টি এক করে দেখেন। ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। একটু লক্ষ্য করলে প্রতিভাত হবে যে রণকৌশল নির্বাচনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রণকৌশলের সফল প্রয়োগ করে রণকৌশলগত সমস্যা সমাধান দুটো আলাদা জিনিস। প্রথমটি নির্বাচন, দ্বিতীয়টি প্রয়োগ। নির্বাচন বা নির্ধারণের বেলায় স্বাধীনতা থাকলেও প্রয়োগ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আদৌ আছে কি? যদি থাকে তবে কতটুকু তা অবশ্যই আলোচনা সাপেক্ষ।

একজন কমান্ডার শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য প্রথমে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেন তা হলো "কিভাবে? এবং কোথায়।" এই "কিভাবে" বিষয়টাই শেষ পর্যন্ত রণকৌশল নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিণত হয়। এটা নিশ্চিত যে একজন কমান্ডার যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ চাপের মুখে কাজ করেন। অতএব সঠিক রণকৌশল নির্বাচনের জন্য তাকে প্রথমেই শত্রু সম্বন্ধে সব সংবাদ সংগ্রহ করতে হয় যা রণকৌশল নির্বাচনের বেলায় বিবেচ্য বিষয় হিসাবে কাজ করে। কমান্ডার প্রথমে শত্রু সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলোকে তার চেতন মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বিচার বিবেচনা করবেন এবং পরে তার আনুশীলনিক পেশাগত জ্ঞান ও দীর্ঘ সামরিক অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ অবচেতন মনের যুক্তিগ্রাহ্য দিক নির্দেশনার আলোকে শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করার জন্যে সঠিক রণকৌশল নির্ধারণ করবেন। যুদ্ধের মতো একটি অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে এবং মুখ্যত পরোক্ষভাবে গৃহীত সাধারণত অনির্ভরশীল সংবাদের উপরে ভিত্তি করে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি একজন কমান্ডারের বিশ্লেষণধর্মী স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। যেহেতু শত্রু সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ পরিবর্তনশীল ; তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি কমান্ডারের নিজস্ব বিচার বিবেচনার ব্যাপারে পরিণত হয়। ফলে একজন কমান্ডারের সিদ্ধান্ত অন্যজনের থেকে সাধারণত ভিন্নতর হয়ে থাকে। তবে সিদ্ধান্ত যদি আনুশীলনিক জ্ঞান ও দীর্ঘ সামরিক অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ চেতন মনের যুক্তিগ্রাহ্য

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়ার আলোকে গৃহীত হয় তা হলে পার্থক্যের মাত্রা কমে আসে। "The quality of decision is like the weltimed swoop of a falcon which enables it to strike and destory its victim".—SUNTZU

এবারে "কোথায়" বিষয়টিকে বিবেচনায় নিলে সিদ্ধান্তে গৃহীত রণকৌশলের প্রয়োগের ব্যাপারটি প্রতিভাত হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় শত্রু বাহিনী সম্পর্কিত সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করে যদি আক্রমণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তবে "কোথায়" শত্রু বেশি দুর্বল সেখানেই সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ পরিচালিত করতে হবে। যদিও শত্রুকে ধোঁকা দেয়ার জন্য অন্যত্র আক্রমণের মহড়া করা যেতে পারে। এখানে যে বিষয়টি দেখার মত তা হচ্ছে একবার আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলে তা অবশ্যই শত্রুর অতীব নাজুক এবং দুর্বল স্থানে পরিচালিত করতে হবে এবং সেই স্থানটি শত্রুর পার্শ্ব আঘাতের বিপরীতে শত্রু বাহিনীর প্রতিঘাত যেন আংশিক হয়। তাহলে জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে স্বাধীন বিচার বিবেচনায় গৃহীত রণকৌশলের প্রয়োগের ক্ষেত্রে খেয়াল খুশির তেমন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। যেমন আক্রমণের সিদ্ধান্ত হল কিন্তু ঐ আক্রমণ শত্রুর পার্শ্ব অবস্থানের নাজুক স্থলে পরিচালিত না করে তা সম্মুখস্থ শক্তিশালী অবস্থানে যদি করা হয় তবে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা আছে। কারণ এক্ষেত্রে উভয় বাহিনীর আঘাত এবং প্রতিঘাত আংশিক হবে। এবং শেষে বিজয় অর্জিত হলেও তা সঠিক ছিল বলা যাবে না।

"Military tactics are like unto water, for water in its natural course runs away from high places and hastens downwards"—SUNTZU

"Attack him where he is unprepared, appear where you are not expected"—SUNTZU

"One of the strongest weapon of offensive warfare is the surprise attack". GENERAL CARL VON CLAUSEWITZ.

রণকৌশলের পৌরাণিক, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক কালের বিবর্তনের ধারাকে বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে, কালের বিবর্তনে এর গুণগত পরিবর্তন সাধিত হলেও চরিত্রগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। উপরোল্লিখিত উদাহরণসমূহ এর জ্বলন্ত প্রমাণ। সানজু ও ক্লজউইৎস–এর সময় রণকৌশলের চরিত্র যা ছিলো আধুনিক কালেও এর চরিত্র তাই আছে। তার কারণ বোধ করি ক্রিয়ার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিক্রিয়া শাশ্বত। যেমন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা। তবে এই প্রতিক্রিয়া যখন যৌথ ও সমন্বিতভাবে প্রকাশ পায়, তখন তার গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন রং প্রধানত পাঁচ রকম নীল, হলুদ, লাল, সাদা ও কালো। কিন্তু এ গুলোর সমন্বয়ে অনেক রংয়ের সমাহার তৈরি করা যেতে পারে। স্বাদ, যেমন মুখ্যত পাঁচ ধরনের—টক, লবণ, কটু, মিষ্টি এবং তিতা। কিন্তু এ সবের সম্মিলনে অনেক ধরনের স্বাদের সৃষ্টি করা সম্ভব।

www.pathagar.com

"In battle, there are not more than two methods of attack. The direct and indirect ; yet these two in combination given rise to an endless series of manoeuvre".—SUNTZU

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ একে অপরকে অনুসরণ করে ঠিক একটি বৃত্তের মাঝে চলার মতো, যা কখনও শেষ হয় না। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষের সমন্বয়ে রচিত সম্ভাবনা কখনও শেষ হবার নয়। আধুনিক যুগে রণকৌশলের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার এর গুণগত পরিবর্তন সাধন করে বৈচিত্র্যময় সীমাহীন সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে। অতএব পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রণকৌশলের সঠিক নির্বাচন এবং সম্মিলিতভাবে (Combined) এর বৈচিত্র্যময়, সীমাহীন সফল প্রয়োগ, একজন কমান্ডারের অনুশীলনিক ও দীর্ঘ সামরিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমৃদ্ধ চেতন ও অবচেতন মনের যুক্তিগ্রাহ্য স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই কেবল নিশ্চিত করা সম্ভব। এবং এভাবেই রণকৌশলগত উদ্ভুত সমস্যার কার্যকরী সমাধান করা যাবে।

উপসংহার

যুদ্ধক্ষেত্রে রণকৌশলগত উদ্ভুত সমস্যার দ্রুত ও নিশ্চিত সমাধান একজন কমান্ডারের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা সর্বাংশে তার চেতন ও অবচেতন মনের যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিক্রিয়াগত প্রতিফলনের উপর নির্ভরশীল। সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে সঠিক প্রতিফলন বাঞ্ছনীয়। এর জন্যে কমান্ডারের চেতন ও অবচেতন মনকে প্রাথমিক পর্যায় হতে নিরবচ্ছিন্নভাবে রণকৌশলের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, যাতে তার মাঝে জানা ও শেখার দ্বারা অর্জিত জ্ঞান সমন্বিত হয়। কারণ একটি সফল সমাধান কেবল সমন্বিত জ্ঞানের দিক নির্দেশনার আলোকেই প্রাপ্ত হতে পারে।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

যুদ্ধ জয়ের জন্য কি বৃহৎ বাহিনী অপরিহার্য?

শুরু হতে শেষ পর্যন্ত লেখার শিরোনাম সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার প্রয়াসের সাথে ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ সম্পূরক সম্ভাব্য জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহেরও অবতারণা করা হবে—যেগুলো হচ্ছে—বড় বাহিনী কি যুদ্ধ জয়ের নিয়ামক? শক্তি ও বিরাটত্ব কি সম্পূরক? অসম যুদ্ধের শেষ ফল কি অবধারিত? এবং পরিশেষে দেশ বিশেষে রণবিজয়ী একটি কাঙ্ক্ষিত বাহিনীর ধারণা কি? কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে এই বাহিনীর গড়ন নির্ধারণ করা যায়। এই ব্যাপারগুলো বড় ছোট সকল দেশের জন্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ? কারণ এর সাথে জড়িত রয়েছে দেশটির সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। অতএব এ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া সবার জন্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। তা না হলে একটি অস্বচ্ছ ও ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকের পক্ষে ক্ষুদ্র ও বৃহতের জয়-পরাজয়ের সহজ সমীকরণের গোলক ধাঁধায় নিপতিত হওয়া এমন বিচিত্র কিছু নয়।

বড় বাহিনী কি যুদ্ধ জয়ের নিয়ামক?

বড় আনন্দ পেতে হলে বিরাট আয়োজন করতে হবে এটা যেমন সব সময় ঠিক নয়; তেমনি বৃহৎ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে নিজের বাহিনীর কলেবরও বিরাট হতে হবে এমন কথাও বোধ করি সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। কারণ ইতিহাসে ক্ষুদ্র বাহিনীর হাতে বৃহৎ বাহিনীর পতনের ও পরাজয়ের ঘটনা অতীতের মতো বর্তমানেও নজির হিসেবে উপস্থিত। ইসলামিক যুগে মুতার যুদ্ধে দশ হাজার মুসলিম সৈন্যের সাথে সমরে এক লক্ষ রোমান সৈন্যের পরাজয় হয়েছিলো। ভিয়েতনামে আমেরিকার এবং আফগানদের হাতে রাশিয়ার বিশাল বাহিনীর পরাজয় সাম্প্রতিককালে প্রমাণ হিসেবে সবার সামনে বিদ্যমান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যুদ্ধের বেলায় ক্ষুদ্র-বৃহত্তের জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে সহজ সমীকরণ সব সময় সত্য হয়ে প্রতিভাত হয় না কেন?

এর উত্তর পাওয়া যাবে যুদ্ধের নীতিমালা; সমর নায়কের নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা ও রণকৌশলের অন্তর্নিহিত মর্মবাণীর মাঝে। সহজ বিশ্লেষণে বলা যায় রণকৌশলই হল মূল উপজীব্য যার সফল প্রয়োগ যুদ্ধে জয় নিশ্চিত করে। অতএব একটি ছোট বাহিনীর সমরাধিনায়ক শত্রুর বৃহৎ বাহিনীর বিরুদ্ধে যদি দক্ষতার সাথে রণনীতির সঙ্গে

www.pathagar.com

সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুদ্ধক্ষেত্রে মানানসই রণকৌশল প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় তবে বড় বাহিনীর মোকাবিলায় ছোট বাহিনীর জয় অবশ্যম্ভাবী হবে এতে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রয়াত চীনা নেতা দেং শিয়াও পিং যেমনটি উক্তি করেছিলেন ; বিড়ালটির রং সাদা বা কালো তা বড় কথা নয় ; আসল বিষয় হল সে ইঁদুর ধরে কি না। এখানেও একটি বাহিনী বড় কি ছোট তা প্রধান ব্যাপার নয় বরং ঐ বাহিনী নৈতিক চরিত্রে প্রশিক্ষণে ও মনোবল ইস্পাত–দৃঢ় কি না সেটিই বিবেচ্য বিষয়। এমন একটি ছোট বাহিনী যখন দক্ষ সমর নায়কের সুচতুর কৌশলে পরিচালিত হয় তখন বৃহৎ বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে সহজেই পরাজিত করতে পারে। আর এটাই অতীতের ন্যায় বর্তমানেও ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়েছে।

শক্তি এবং বিরাটত্ব কি সম্পূরক?

মেদবহুল বিশাল বপুর চেয়ে পেশীবহুল হালকা শরীর যেমন অনেক বেশি শক্তিশালী তেমনি শক্তির মৌলিক উপাদান বর্জিত বড় বাহিনীর চেয়ে ঐ সকল উপাদান সমৃদ্ধ ক্ষুদ্র বাহিনী ঢের বেশি প্রাণবন্ত ও দক্ষ। একটি দেশের সশস্ত্র বাহিনী আয়তনে যাই হোক না কেন তার শক্তিশালী হওয়ার জন্য যে মৌলিক উপাদানগুলির উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য তা হচ্ছে—প্রথম : জাতিগত সংবদ্ধতা ; দ্বিতীয় : স্বধর্মে বিশ্বাস ; তৃতীয় : গৌরবময় অতীত ও বর্তমান ইতিহাস ; চতুর্থ : দক্ষ নেতৃত্ব ; পঞ্চম : উন্নত প্রশিক্ষণ ; ষষ্ঠ : উচ্চ পেশাগত জ্ঞান এবং পরিশেষে অদম্য আত্মবিশ্বাস ও উঁচু মনোবল। জাতীয় জীবনে এই সকল মৌলিক উপাদান দেশের জন্য যেমন Element of National Power হিসাবে কাজ করে তেমনি ; যেহেতু জাতীয় সশস্ত্র বাহিনী দেশের জনগণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই এই একই উপাদান তাদের ক্ষেত্রেও শক্তির অন্তর্নিহিত উৎস হিসাবে কাজ করে। এখানে Element of National Power হিসাবে যে উপাদানসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রচলিত ধারণার একটি ব্যতিক্রম। কারণ উন্নত দুনিয়ায় Element of National Power–এর অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলো হচ্ছে : Defence and Military, Socio-Political Environment, Economy, Science and Technology এবং International Relations. উন্নত বিশ্ব এই ধারণার প্রবর্তক। কিন্তু সাম্প্রতিক উন্নত দুনিয়ার কিছু দেশ বিশাল প্রতিরক্ষা বাহিনী ; উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ; মজবুত অর্থনীতি এবং উন্নত প্রচার মাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত আন্তর্জাতিক মতামতের আনুকূল্য পাওয়া সত্ত্বেও উন্নয়নশীল বিশ্বের ক্ষুদ্র দেশ ও সমর সম্ভারে অনগ্রসর ও আয়তনে বেশ ছোট বাহিনীর দ্বারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার ফলে উন্নত দুনিয়ার Element of National Power সংক্রান্ত ধারণার আর যুক্তিগ্রাহ্যতা আছে বলে মনে হয় না। এই অসারতার অনুকূলে যে অসঙ্গতি প্রকটভাবে প্রতিভাত হয় তা

www.pathagar.com

হচ্ছে উন্নত বিশ্বের Element of National Power এর এই ধারণা মেনে নিলে এটাও মেনে নিতে হয় যে উন্নত দুনিয়ার যে কোন দেশের সাথে যুদ্ধে উন্নয়নশীল দেশের পরাজয় অবধারিত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। উন্নত বিশ্বের শীর্ষ দেশ আমেরিকা ভিয়েতনামের কাছে এবং পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ রাশিয়ার সর্ববৃহৎ বাহিনী আফগানিস্তানের মত উন্নয়নশীল দেশের বাহিনীর নিকট অপমানজনকভাবে পরাজয় বরণ করে যে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছে তা হল একটি দেশ আয়তনে বিরাট ; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত ও মজবুত অর্থনীতির ধারক এবং বিশাল বাহিনীর অধিকারী হলেই যে উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দেশ ও ছোট বাহিনীর বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করবে এমনটি ভাববার কোন কারণ নাই। বরং যত দিন যাচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বের Element of National Power–এর ধারণা দেশ ও জাতির এবং জাতীয় সশস্ত্র বাহিনীর শক্তির মূল উৎস ও প্রধান নিয়ামক হিসাবে ক্রমাগতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অতএব শক্তি ও বিরাটত্ব একে অপরের সম্পূরক এমন ধারণা আর ধোপে টিকছে না।

অসম যুদ্ধের শেষ ফল কি অবধারিত?

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধের জয় পরাজয়ের প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাবে যুদ্ধের নীতিমালা, সমর নায়কের নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা ও রণকৌশলের অন্তর্নিহিত মর্মবাণীর মাঝে। এক্ষেত্রে রণকৌশলই হলো মূল উপজীব্য যার সফল প্রয়োগ যুদ্ধে জয় নিশ্চিত করে। এখানে যুদ্ধরত বাহিনীর কলেবর ও সমর সম্ভার একমাত্র বিবেচ্য নয়। তদুপরি যুদ্ধের জয়–পরাজয় যুদ্ধরত দেশসমূহের সামরিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারা প্রধানত নির্ধারিত হয়। এছাড়া উভয় পক্ষের যুদ্ধ পরিচালনার দক্ষতার দ্বারাও এটা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একজন সমর নায়কের কর্তব্য হচ্ছে, যুদ্ধ পরিচালনার নিয়ম ও নীতিমালাসমূহকে গভীর মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা ও বিচার বিবেচনা করা, যেগুলো যুদ্ধে সামরিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। যার মধ্যে রয়েছে যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়, নিজের ও শত্রুর বাহিনীর মধ্যকার পার্থক্যসমূহ, যুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল। অর্থাৎ যুদ্ধ পরিচালনার সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সমর নীতির প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণ করে দেশের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ এমন সব রণনীতি ও রণকৌশল অবলম্বন করা যা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ বাহিনীকে অনুকূল ও শত্রুকে প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত করে আক্রমণ অথবা প্রতিরক্ষার দ্বারা শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত করা যায়। অসম যুদ্ধে সমর নায়ককে প্রথাগত সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে বাস্তবতার নিরিখে যথাযথ ও কার্যকরী রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করে শত্রুর বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করে যুদ্ধের পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে ক্রমাগতভাবে শত্রুর শক্তিকে ক্ষয় করে অবশেষে জয় নিশ্চিত করতে হবে।

www.pathagar.com

রণনীতির সামগ্রিক বিশ্লেষণে সমর নায়কের যুদ্ধের নিয়ম (Law of War) এবং যুদ্ধ পরিচালনার নিয়ম সমূহের (Law of Directing War) সম্যক উপলব্ধি এবং বাস্তবতার নিরিখে যুদ্ধক্ষেত্রে রণনীতি ও রণকৌশলের শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে চাতুর্যের সাথে অভিনব পন্থায় সফল ও কার্যকরী প্রয়োগ যুদ্ধে জয় নিশ্চিত করবে, তা সে যুদ্ধ অসম কিংবা সমানে সমান হোক না কেন।

রণবিজয়ী কাঙ্ক্ষিত বাহিনীর ধারণা

ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান যেমন একটি দেশের রাজনৈতিক মূল উপজীব্য অর্থাৎ বিশ্ব মানচিত্রে একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান যেভাবে দিক-নির্দেশনা দেবে সেভাবেই একটি দেশের রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রণীত হবে। ঠিক একইভাবে ভূ-রাজনৈতিক বিষয় অর্থাৎ ভূমির অবস্থান একটি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর আয়তন ও আদল সম্বন্ধেও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে ভূ-প্রকৃতি প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবকাঠামো ও বিন্যাস নির্ধারণ করে। কারণ একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে প্রতিবেশী দেশসমূহের সীমারেখাজনিত আন্তঃসম্পর্ক ঐ দেশের ভূখণ্ডগত প্রতিরক্ষার প্রকৃত প্রয়োজন কি, তার দিক নির্দেশনা দেয়। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে নিজ দেশের সীমারেখার সামরিক দৃষ্টিকোণ হতে চুলচেরা বিশ্লেষণ (Threat Analysis) করলে এবং তা প্রতিহত করার রণনীতি ও রণকোশল নির্ধারণ হলে দেশের Defence need ও Forces goal সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে, যার উপর ভিত্তি করে দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর আয়তন, আদল, বিন্যাস ও অবকাঠামো গড়ে উঠবে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভিন্নতর হবার কারণে রাজনৈতিক নির্দেশনা ও পরিকল্পনা যেমন এক এক রকম হয়ে থাকে, তেমনি একই কারণে প্রত্যেকটি দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর আকার, আদল ও আয়তনও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন, ইংল্যান্ডে সমুদ্রের প্রভাবে বাহিনীত্রয়ের মধ্যে নৌবাহিনীর গুরুত্ব বেশি, তেমনি ভূমিসীমার প্রভাবে ভারতে সেনাবাহিনীর গুরুত্ব সর্বাধিক। অপরদিকে স্থল বেষ্টিত হবার কারণে নেপালের কোনো নৌবাহিনী নেই এবং এর প্রভাব সরাসরি রণনীতি ও রণকৌশলের উপরেও পড়ে। অর্থাৎ দেশ বিশেষে যুদ্ধ কৌশল ও প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এক এক রকম হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে একটি উন্নয়নশীল দেশ যার অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত নয়, সে তার দেশের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সামগ্রিক ও জাতীয়ভাবে নিশ্চিত করতে যে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে তাতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাথে দেশের জনগণকে অবশ্যই সম্পৃক্ত করবে, যাতে স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষে দেশটির Defence need ও forces goal-এর দাবি দেশের দুর্বল অর্থনীতির উপরে বাড়তি চাপ না দিয়ে সহজেই মেটানো যায়। অতএব একটি দেশের রণবিজয়ী কাঙ্ক্ষিত বাহিনীর আয়তন ও আদল ভূ-রাজনীতির

www.pathagar.com

নিরিখে প্রতিরক্ষার বাস্তবসম্মত চাহিদার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হবে। ঠিক অংকের ফলাফলের মতো, এতে কম বা বেশির তেমন অবকাশ নেই। পরিশেষে পেটের ক্ষুধা যেমন কল্পিত আহারে নিবারণ হয় না, তেমনি দেশের প্রতিরক্ষার চাহিদাও বিলাসী মনের ভাব চিন্তার দ্বারা মেটানো যায় না। দেশের প্রতিরক্ষার মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে রাজনৈতিক পরিকল্পনায় যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত ও সেভাবে বাস্তবায়ন না করলে একটি জাতিকে কি পরিমাণ মূল্য দিতে হয়, মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েত তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ ; যা থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে।

উপসংহার

যুদ্ধ জয়ের জন্য বড় বাহিনী ও বিপুল রণসম্ভার প্রয়োজন, বৃহৎ বাহিনীর সাথে সমরে ক্ষুদ্র বাহিনীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—শক্তি ও বিরাটত্ব সম্পূরক এবং অসম যুদ্ধের শেষ পরিণতি অবধারিত, এমন সব বদ্ধমূল ধারণার পশ্চাতে এক ধরনের আয়াস বর্জিত সহজ সমীকরণের প্রবণতা কাজ করে। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনাপঞ্জি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, অতীতের মতো বর্তমানকালেও প্রায় ক্ষেত্রে তা সত্যে পরিণত হয় নাই।

এর উত্তরে পাওয়া যাবে যুদ্ধের নীতিমালা, সমর নায়কের নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা ও রণকৌশলের অন্তর্নিহিত মর্মবাণীর মাঝে। তদুপরি উন্নত বিশ্বে Element of national power–এর ধারণার অসারতা ; পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল দুনিয়ার মাটি ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত ব্যতিক্রমধর্মী Element of national power–এর উপাদানসমূহ উন্নয়নশীল দেশের জনগণ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীকে অসম যুদ্ধে যুগিয়েছে শক্তির অফুরন্ত উৎস। অতএব দেশ বিশেষে রণবিজয়ী একটি কাঙ্ক্ষিত বাহিনীর আয়তন, আদল, বিন্যাস ও অবকাঠামো গড়ে উঠবে দেশের ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-প্রকৃতির চুলচেরা বিশ্লেষণ ও প্রতিরক্ষার বাস্তবসম্মত চাহিদার ভিত্তিতে। আর এই বাহিনী শক্তি সঞ্চয় করবে দেশের মাটি ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত Element of national power–এর অফুরন্ত উৎস হতে।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

প্রেক্ষাপট : উপসাগরীয় যুদ্ধ

উপসাগরীয় যুদ্ধ সমসাময়িককালের একটি বর্বর অধ্যায়। এই সভ্য দুনিয়ায় মধ্যযুগীয় কায়দায় শক্তিশালী দেশ অন্য একটি ক্ষুদ্র দেশকে সামরিক শক্তি দ্বারা জবরদখল করে নিতে পারে, তা যেমন ছিলো অভিনব তেমনি যুগান্তকারী। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল বিশ্ব সমাজকে করেছিলো স্তম্ভিত ও তড়িতাহত। শত বছরের কষ্টার্জিত সভ্যতা হয়েছিলো ধ্বংসের মুখোমুখি। এই বর্বর আক্রমণ আধুনিক চিন্তা, চেতনা, মন এবং মানসে হেনেছিলো চরম আঘাত। সবার মুখে একই কথা—এটা কি করে সম্ভব? আজকের এই সভ্য দুনিয়ায় একি অনাচার? মানবিক মূল্যবোধ, ব্যক্তি এবং জাতিগত স্বাধীনতার একি চরম পরাজয়! বিশ্ব কি পুনরায় মধ্যযুগে ফিরে গেল? ইরাকের নিষ্ঠুর আগ্রাসন বিশ্বের জাতিসমূহের মন মানসে ক্ষণিকের বৈকল্য ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা সৃষ্টি করলেও, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী আধুনিক সভ্যতার মূল মন্ত্রে বলীয়ান বিশ্ব সমাজ সকল আবিলতা ও সংকীর্ণতা পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়তার সাথে এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান কামনা করে ইরাকের প্রতি সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাকে কুয়েত হতে নিঃশর্ত প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়। যখন তাতে কাজ না হয়, তখন বিশ্ব সমাজ জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে অগত্যা বাধ্য হয়ে সম্মিলিত সামরিক শক্তি ইরাকের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এবং কুয়েত জবরদখল মুক্ত হয়।

যুদ্ধের কারণ

যুদ্ধের সর্বস্বীকৃত কারণ হচ্ছে, রাজনীতি যেখানে তার স্বাভাবিক চলায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেখানে যুদ্ধ তা অপসারণ করে রাজনীতির চলার পথ পরিষ্কার করে। তবে যুদ্ধের কারণের মর্মমূলে রয়েছে অর্থনৈতিক বিষয়। বিশ্বে এমন কোনো যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি যার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ ছিলো না। বর্তমান বিশ্বেও যুদ্ধের কারণ মূলত অর্থনৈতিক, তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় ভাবেই হতে পারে। মধ্যযুগে যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ বিজয়ের যে ধারা প্রচলিত ছিলো তাতেও অর্থনৈতিক বিষয় সম্পৃক্ত ছিলো। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ঐ সময় যুদ্ধ অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া অন্য কারণেও বেঁধে যেতো। যেমন কোনো সুন্দরী রমণী কিংবা গুণীজনকে নিজ দখলে নেবার মতো বিষয়ও যুদ্ধের কারণ

www.pathagar.com

হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতো। এক্ষেত্রে যে প্রবণতাসমূহ ক্রিয়াশীল ছিলো তা হচ্ছে দাম্ভিকতা, শক্তির মদমত্ততা, অবিসংবাদিতা এবং জৌলুশ বর্ধনের মোহ। উপসাগর যুদ্ধে ইরাকের প্রেক্ষিত বিবেচনায় নিলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের কারণ হিসাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রতিভাত হয়—

ক. মনস্তাত্ত্বিক : ইরাকের অতীত এবং বর্তমান রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে ইরাক অতীতে যেমন রাজতন্ত্রের অধীনে একক ব্যক্তি শাসনে বাধা ছিলো, তেমনি বর্তমানেও ব্যক্তি শাসনের নিগড়ে আবদ্ধ। সাদ্দাম হোসেন আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন ব্যক্তি শাসনের ঐতিহাসিক পরম্পরা। যে সকল দেশে রাজতন্ত্রের অবসানের পর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়নি ঐ সকল দেশে রাজতন্ত্রের নব্য সংস্করণ হিসেবে চেপে বসেছে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। যার মূলমন্ত্র হচ্ছে, কৌশলে ক্ষমতায় টিকে থাকা। এর জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব করা, তাতে দেশ এবং জাতির যে কোনো প্রকার মারাত্মক পরিণতি হউক না কেন। রাজনৈতিক ভণ্ডামি এবং মিথ্যাচার হলো স্বৈরশাসনের মুখ্য অস্ত্র, যা সে জাতির উপরে প্রয়োগ করে অহরহ। ফলে দেশ এবং জাতির মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃদ্ধি রহিত হয় এবং গোটা দেশ অন্ধাকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতে থাকে। ক্রম নিমজ্জমান দেশ ও জাতিকে চাংগা করার জন্য স্বৈরশাসককে মিথ্যা আস্ফালন এবং বাগাড়ম্বর করতে হয়, আশ্রয় নিতে হয় নানা প্রকার কপটতার। এর জন্য প্রয়োজন হলে এমন সব মারাত্মক আত্মঘাতী পরিকল্পনা এবং অভিযান তাকে পরিচালনা করতে হয়, যা শেষ অবধি দেশ ও জাতির জন্য চরম ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত আক্রমণ ছিলো এমনি একটা অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বরপূর্ণ অভিযান, যার দ্বারা তিনি যে কেবল নিজের দেশের অন্ধকারে রাখা জনগণকেই তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাই নয়, তিনি বোকা বানাতে চেয়েছিলেন সারা দুনিয়ার মানুষকে। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি কিছু কিছু ব্যক্তিকে বোকা বানিয়েছিলেন বৈকি। কিন্তু সবাইকে তো দীর্ঘকাল গোলক ধাঁধায় রাখা সম্ভব নয়। তাই স্বৈরশাসকের শেষ অবধি যা হবার তাই হলো। সাদ্দামকে নতজানু হতে হলো বিশ্ব বিবেকের কাছে। যদিও সাদ্দাম ক্ষমতায় টিকে আছেন, কিন্তু তাঁর যে রাজনৈতিক মৃত্যু হয়েছে তা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না। শেষ পর্যন্ত সাদ্দাম হয়তো শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকবেন ঐ সময় পর্যন্ত ; যা কৌশলগত কারণে ক্ষমতাশীনদের জন্য লাভজনক বা যতক্ষণ মনস্তাত্ত্বিকভাবে বৈকল্যগ্রস্ত জাতি জেগে উঠে তাঁর পতন ঘটায়।

খ. নেতৃত্বের মোহ : তেল সমৃদ্ধ ইরাকের বিপুল অর্থ ভাণ্ডার স্বৈরশাসক সাদ্দামকে করেছিলো মোহগ্রস্ত। যে কোনো স্বৈরশাসকের মতো তিনিও এই অপরিমিত তেল সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ জনগণের উপকারে ব্যয় না করে তা দিয়ে গড়ে তুলেছেন

www.pathagar.com

বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডার, যার মূল উদ্দেশ্য ছিলো ইরাকের উপর নিজের ক্ষমতা নিরংকুশ করা এবং সেই সাথে আরব প্রতিবেশীদের নিকট নিজের নেতৃত্বের অবিসংবাদিতা প্রমাণ করা। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে শিল্প ও প্রযুক্তি উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন তেলের। আরব দুনিয়ার এই তেলের মজুদ সর্ববৃহৎ হবার কারণে উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে পশ্চিমা দুনিয়া এবং জাপান আরবদের তোয়াজ করে চলে। সাদ্দাম চেয়েছিলেন সামরিক শক্তির দ্বারা এককভাবে আরব দুনিয়াকে পদানত করে এই বিশাল তেল সম্পদকে নিয়ন্ত্রণে এনে আরব জাহানের একচ্ছত্র নেতা হয়ে বিশ্ব ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে।

গ. অর্থনৈতিক : সাদ্দাম হোসেন জানতেন, তিনি যে বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডার এবং সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছেন তা অনাগত কালের জন্য ইরাকের পক্ষে রক্ষণাবেক্ষণ করা অসম্ভব। তাই অন্য কোনো উৎস হতে যদি অর্থ সংগ্রহ করে এই অস্ত্র ভাণ্ডার এবং সেনাবাহিনীকে রক্ষণাবেক্ষণ করা না যায়, তবে তার পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই তাঁকে কুয়েতের মতো ক্ষুদ্র অথচ বিপুল তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশে অভিযান পরিচালনা করে তা দখল করতে হয়েছিলো। কুয়েত ইরাকের দখলে থাকলেও এর বিরাট তেল সম্পদ ইরাকের সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কোনোদিনও ব্যবহৃত হতো না ; বরং তা সাদ্দামের স্বৈরশাসনকে মজবুত এবং তাঁকে আরো দুর্বিনীত এবং শান্তিকামী দুনিয়ার জন্য আরো বিপজ্জনক করে তুলতো।

যুদ্ধের ফলাফল

উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলাফল বর্তমানের চেয়ে বরং ভবিষ্যতেই সামগ্রিকভাবে নির্ধারণ করবে। এই যুদ্ধ যে নব্য ধারার, নতুন উপলব্ধি এবং চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে তা যতখানি না দেখা যায়, এর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় তার চেয়ে ঢের বেশি। উপসাগরীয় যুদ্ধের নৈতিক প্রভাব বিশ্বের জাতিসমূহের উপরে বেশ কিছুদিন বাধাগ্রস্ত হবে, কারণ স্বার্থের সংঘাত বিশ্ব ব্যবস্থাকে এখনও আড়ষ্ট করে রেখেছে। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এমন একটা দিক নির্দেশনা বিশ্বের সামনে প্রতিভাত হয়েছে যা অদূর ভবিষ্যতে সারা মানব জাতিকে এক পতাকাতলে সমবেত করবে। যেমনটি বলা হয়েছে যে, এই যুদ্ধের সামগ্রিক ফলাফল ভবিষ্যতেই নির্ধারিত হবে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর একটা আবছা ধারণা দেয়া যেতে পারে। এমনি কিছু মতামত নিম্নে আলোচনা করা গেল—

ক. চিন্তা ও চেতনার প্রভাব : এই যুদ্ধ মানুষের চিন্তা ও চেতনাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। ইরাকের এই আগ্রাসন বিশ্বের সাধারণ মানুষকে করেছে প্রতিবাদী। একটি বৃহৎ এবং শক্তিশালী প্রতিবেশী তার ক্ষুদ্র ও দুর্বল প্রতিবেশীকে বাহুবলে দখল

www.pathagar.com

করে নেবে, এমন ধারণা বিশ্ব সমাজ ঘৃণাভরে যে শুধু প্রত্যাখ্যান করেছে তাই নয়, আক্রমণকারী ইরাকের বিরুদ্ধে বিশ্বের ছোট–বড় সমস্ত দেশ হয় প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছে ; নয় তো সম্পদ দিয়ে নৈতিক সমর্থন যুগিয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে বিষয়টি তা হচ্ছে, ইরাকের বিরুদ্ধে বিশ্ব সমাজকে এক হতে ধর্ম কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অর্থাৎ অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে বিশ্ব মানবতার চিন্তা ও চেতনার ঐক্য ধর্ম–বর্ণ ও আঞ্চলিকতার গণ্ডিকে অতিক্রম করে একটি ঐকমত্যের বেদীতে এসে মিলিত হয়েছে, যদিও এই ঐকমত্যের অভ্যন্তরে কিছু কিছু রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যক্তি ও জাতির স্বার্থ জড়িত ছিলো। কিন্তু সেটা মুখ্য বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়নি। এ যুদ্ধে আরো যে নৈতিক বিষয়টি অর্জিত হয়েছে তা হলো, এখন হতে কোনো দেশ বা রাষ্ট্রগোষ্ঠী তারা যত শক্তিধরই হউক না কেন, বিশ্বের অন্য কোনো দেশ বা জাতির বিরুদ্ধে হানিকর কিছু করে বিনা প্রতিবাদে পার পেয়ে যাবে না। তাই তো আজ জাতিসংঘ এবং নিরাপত্তা পরিষদকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার ব্যাপারে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর তরফ থেকে দাবিদাওয়া উত্থাপিত হচ্ছে। এই যুদ্ধের ফলে অর্জিত নৈতিকতার ব্যাপ্তি অতীব সুদূর প্রসারী হবে, যা বিশ্ব মানবতার মন ও মানসিকতাকে অনাগত ভবিষ্যৎ চিন্তাধারায় একটি নতুন শোষণমুক্ত ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে।

খ. উপলব্ধির নতুন ধারা : উপসাগরীয় যুদ্ধ আরও যে বিষয়টির উন্মেষ ঘটিয়েছে তা হলো, সম্পদ ও শক্তি থাকলেই আলাদা হয়ে বাঁচা যায় না। এই যুদ্ধ বিশ্বের জাতিসমূহকে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে আঞ্চলিকভাবে জোটবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যদিও আঞ্চলিক জোট এই যুদ্ধের পূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিলো। তবে তাতে আজকের এই নবতর উপলব্ধির এমন জোরালো উপস্থিতি ছিলো না। এই সমস্ত জোটের মূলে ছিলো অর্থনৈতিক বন্ধন। কিন্তু আজকে জোটসমূহের চালিকা শক্তি হচ্ছে ব্যক্তি ও জাতিগত স্বাধীনতাসহ আগ্রাসন মুক্ত হয়ে সার্বিকভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচার প্রেরণা। এই নবতর উপলব্ধি একদিকে যেমন রাষ্ট্র বা জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সব ধরনের আগ্রাসনকে অপনোদন করবে, তেমনি জোটবদ্ধ জাতিসমূহের মাঝে সঞ্চারিত হবে নৈতিক ও মানসিক শক্তি। এই শুভসূচনা একদিন বিশ্বের সব জাতিকে সমানাধিকার ভিত্তিতে বিশ্ব সভায় এক আসনে অধিষ্ঠিত করবে। আপাতঃদৃষ্টিতে এই অধিকার ভিত্তিক অধিষ্ঠান সুদূর পরাহত মনে হতে পারে। কিন্তু স্বার্থের সংঘাত বিশ্ব সমাজকে আর বেশি দিন বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারবে না। শোষকের মৃত্যু ঘন্টা ইতোমধ্যেই বেজে গিয়েছে। এর নির্মূল কেবল সময়ের ব্যাপার। কারণ, উপলব্ধির জয় অবশ্যম্ভাবী।

গ. প্রকৃত চেতনায় বিশ্ব সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু : ইতোপূর্বে একটি একীভূত বিশ্ব সমাজ গঠনের নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা বিদ্যমান থাকলেও এই উপসাগরীয় যুদ্ধে তার একটি ভিত্তি রচিত হয়েছে। এখন সম অধিকারের ভিত্তিতে এক বিশ্ব গঠনের বিষয়টি

www.pathagar.com

আর কোনো বিলাস চিন্তার স্বাপ্নিক ব্যাপার নয়। মানুষ এখন আরো আত্মসচেতন হয়েছে নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। এ জন্য যদি আরো মূল্য দিতে হয় তারা তাও দিতে তৈরি। আজ একটি দুর্বল ও ক্ষুদ্র দেশ নিজেকে বাস্তবে একা এবং মূল্যহীন ভাবনা ভাবছে না। বিপদে সারা পৃথিবী তার পাশে এসে দাঁড়াবে, এমন একটা নিশ্চয়তা উপসাগরীয় যুদ্ধে সে পেয়েছে। এ জন্যে ঐ সকল দেশ তাদের মতামত আরো জোরালো কণ্ঠে বিশ্বসভায় উচ্চারণ করছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই বিশ্বব্যবস্থা শুভ পরিণতির দিকে যদিও কিছু স্বার্থান্বেষী দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়ে ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, তবুও তা নিঃসন্দেহে একটি আশার কথা। কোনো বৃহৎ কিছুই একদিনে অর্জিত হয় নি। এর জন্যে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা যা অর্জিত হয়েছিলো, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে স্বার্থান্বেষীদের হাতে অবদমিত হলেও উপসাগরীয় যুদ্ধে তা আবার নতুন জীবন প্রাপ্ত হয়ে নবচেতনায় উজ্জীবিত হয়েছে। এই চেতনা বিশ্বসমাজকে নাড়া দিয়েছে ভীষণভাবে। আজ একটি বৃহৎ দেশ একটি ক্ষুদ্র দেশকে গ্রাস করবে, এমন ভাবাই যায় না। এই পরিবর্তিত ধারার প্রারম্ভ একটি নবযুগের সূচনা করেছে। এই সূচনাই একদিন সুন্দর পরিণতির মধ্য দিয়ে একটি নতুন সমানাধিকার ভিত্তিক বিশ্বসমাজ গঠন করবে, যেখানে ক্ষুদ্র ও বড় একে অপরের সম্পূরক হিসেবে নিজেদের বিকাশ সাধনে প্রবৃত্ত হবে।

ঘ. সম্মিলিতভাবে আগ্রাসন মোকাবিলা : ইরাকের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে আগ্রাসন মোকাবিলায় সারা বিশ্বের ঐকমত্য ভিত্তিক একটি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ বর্তমান সময়ে একটি অনুপম ও অভিনব ঘটনা। অতীতে দুটি মহাসমরে বিশ্ব শিবিরভুক্ত ছিলো। কিন্তু এবারেই কেবল পৃথিবী শিবিরভুক্ত না হয়ে এক বেদীতে অবস্থান নিয়েছে। এই ঘটনাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। এর ফলাফল যে সুদূরপ্রসারী ও শুভ পরিণতি লাভ করবে, আপাতদৃষ্টিতে তা অস্পষ্ট মনে হলেও তা অবধারিত ; সে কেবল সময়ের ব্যাপার। এর প্রভাব সমাজ চেতনার গভীরে প্রবেশ করেছে, যা নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক।

আজকে আগ্রাসন মোকাবেলায় বিশ্ব সমাজ একত্রিত হয়ে আগ্রাসনকারীকে উৎখাত করবে, এটাই যেন বাস্তবতা। এর পেছনে সম্ভাব্য যে কারণগুলো ক্রিয়াশীল রয়েছে তা হচ্ছে, প্রথম. আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাধারা আরো সমৃদ্ধ হয়ে একে অপরকে স্পর্শ করেছে ; দ্বিতীয়. আধ্যাত্মিক উন্নয়নের দ্বারা এক জাতি অন্য জাতির আত্মার আত্মীয়তে পরিণত হয়েছে ; তৃতীয়. আজকে মানুষের চিন্তাধারা দেশ, জাতি ও ধর্মের সীমা অতিক্রম করে একটি বিশ্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এরই স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে উপসাগরীয় যুদ্ধে। কিছু কিছু শক্তিধর দেশ অর্থনীতির অমোঘ নিয়মে এই যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো কিন্তু তাদের অজান্তেই তারা এমন একটি বিশ্বব্যবস্থায় অংশ নিয়েছে, যা একদিন তাদেরকেই কঠোরভাবে

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ করবে। যদি তারা তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে হয়তো সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন বিশ্ব সমাজ ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আরো একটি মহাসমরে অবতীর্ণ হবে। আর এর ভিত্তি ইতোমধ্যেই উপসাগরীয় যুদ্ধে রচিত হয়েছে।

জয়-পরাজয়

আসলে উপসাগরীয় যুদ্ধে কি কোনো প্রতিপক্ষ ছিলো যে জয়-পরাজয় নিরূপণ করা যায়? একদিকে ইরাক একা, অপরদিকে সারা দুনিয়া। এই অসম যুদ্ধে ইরাককে প্রতিপক্ষ ঠাওরানো কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা বিচার্য বটে। এটা কি বলা সমীচীন যে, এই যুদ্ধে ইরাকের পরাজয় এবং বিশ্বের জয় হয়েছে? এই যুদ্ধে ইরাক যে হারবে এ-তো অবধারিত ছিলো। একশত বার যুদ্ধ হলেও ইরাক একশতবার হারতো। আর যাই হোক ইরাকের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশকে বিশ্বের প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো একটি সম্মানজনক ব্যাপার নয়। তবে হ্যাঁ, যা হয়েছে তা হলো এ যুদ্ধে ন্যায়ের জয় এবং অন্যায়ের পরাজয় হয়েছে যার কৃতিত্ব সারা পৃথিবীর। কোনো দেশ বা জাতিগোষ্ঠী এককভাবে তা দাবি করতে পারে না। যদি কোনো জাতি উপসাগরীয় যুদ্ধের জয়কে নিজ দেশের অতীতের কোনো পরাজয় গ্লানিকে মুছে ফেলবার জন্য একান্ত নিজের বলে দাবি করে, তবে তা সেই জাতিকে গ্লানিমুক্তির বদলে মনোবৈকল্যের আরো গভীরে নিমজ্জিত করতে পারে। কারণ তা হতে হবে একক। এমন বীরত্ব তো এ যুদ্ধে এককভাবে প্রদর্শনের কোনো অবকাশ ছিলো না। অতএব বলা যায়, উপসাগরীয় যুদ্ধে জয় হয়েছে বিশ্ব সভ্যতার আর পরাজয় হয়েছে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা প্রসূত আগ্রাসী বাহুবলের।

উপসংহার

ইরাক কর্তৃক কুয়েত জবর দখল এবং পরবর্তীতে জাতিসংঘ সনদের আওতায় সম্মিলিতভাবে ইরাককে পদানত করা এবং বর্তমানে ইরাকের একঘরে অবস্থা যুগ সন্ধিক্ষণের একটি অমোঘ পরিণতির ফল। এই শুভ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ উপসাগর যুদ্ধের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়ে ধীর গতিতে সূচনার পথে অগ্রসর হচ্ছে। প্রতিটি যুদ্ধের উদ্দেশ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয় নিহিত থাকে। কিন্তু একটু অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে তাকালে দেখা যাবে যে, উপসাগরীয় যুদ্ধ অর্থনীতির সংকীর্ণ গণ্ডিকে ছাড়িয়ে বিশ্বসমাজকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাইতো ইরাকী আগ্রাসন মোকাবিলায় পৃথিবীর জাতিসমূহের মাঝে ধর্ম, বর্ণ, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সমস্যাদি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে এই যুদ্ধের সুদূর প্রসারী ফলাফল, যা শেষ পর্যন্ত একটি সম অধিকারভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে মধুরেণ সমাপয়েৎ হবে। আর সেদিন বোধ করি বেশি দূরে নয়।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. Maj. Gen. D. K. Palit, The Essentials of Military Knowledge, Palit & Dutt. (Publishers), Dehra Dun (India), 1968 Reprinted 1970

২. Arjan Dass Malik, Alexander the Great A Military Study, Light & Li Publishers, New Delhi, 1978

৩. Brig J. Nazareth (Retd.), The Analysis and Solution of Military Problems, Lancer Publishers Pvt. Ltd, New Delhi : 1991

৪. Suntzu, The Art of War, Hodder & Stoughton, London : 1981

৫. Michael D. Stephens, The Educating of Armies, The Macmillan Press Ltd, London : 1989

৬. General Carl Von Clausewitz, Principles of War, Army Publishers, Delhi

৭. সুবোধচন্দ্র মজুমদার, কাশীদাসী মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব; দেব সাহিত্য কুটির (প্রাইভেট) লিঃ, কলকাতা, ১৫ মে ১৯৯২

৮. Carl Von Clausewitz, On War ; Penguin Books Ltd. (England), Reprinted 1983, 1984, 1985 (twice).

৯. Abul-Fazl Allami, The Ain-E-Akbari, Vol.-1 ; Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi, 1992

১০. মনসুর মুসা, বাংলাদেশ (বাংলা বিভাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; মোহাম্মদ নাসির আলী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা : ১৯৭৪

১১. মাওলানা আখ্তার ফারুক, খালেদ ইব্নে-ওলীদ, এমদাদিয়া প্রেস, (ঢাকা-১১), তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৭৮

১২. T. V. Paul, Asymmetric Conflicts : War Initiation by Weaker Power, Press Syndicate of the University Cambridge, (USA), first published 1994

১৩. Williamson Murray, Mac Gregor Knox and Alvin Bernstein, The Making of Strategy Rulers, States and War, Press Syndicate of the University Cambridge (USA), 1994

১৪. Ian O Lesser, Resources and Strategy ; Scholar and Reference Division, St Martin's Press, Inc, (USA), First publisher in the USA in 1989

১৫. বাল্মীকি, রামায়ণ, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটির (প্রাইভেট লিঃ), কলিকাতা।

১৬. জাতীয় প্রতিরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়, চীন কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত মিলিটারী ডাইলেকটিক্স বিষয়ক রচনা।

www.pathagar.com

১৭. মাও সেতুংয়ের প্রবন্ধসমূহ।

১৮. জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ, পাকিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রেসি।

১৯. মহাভারত (বেদব্যাস রচিত কুরু পাণ্ডবের কাহিনী বিষয়ক সংস্কৃত মহাকাব্য)।

[illegible] সাংকৃত্যায়ন, ভোলগা থেকে গঙ্গা।

[illegible] স্কুব রহমান তরফদার, হোসেন শাহী বেঙ্গল।

[illegible] কর্নেল কর, মিলিটারী হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ওরিয়েন্ট লংগম্যান, ১৯৬০
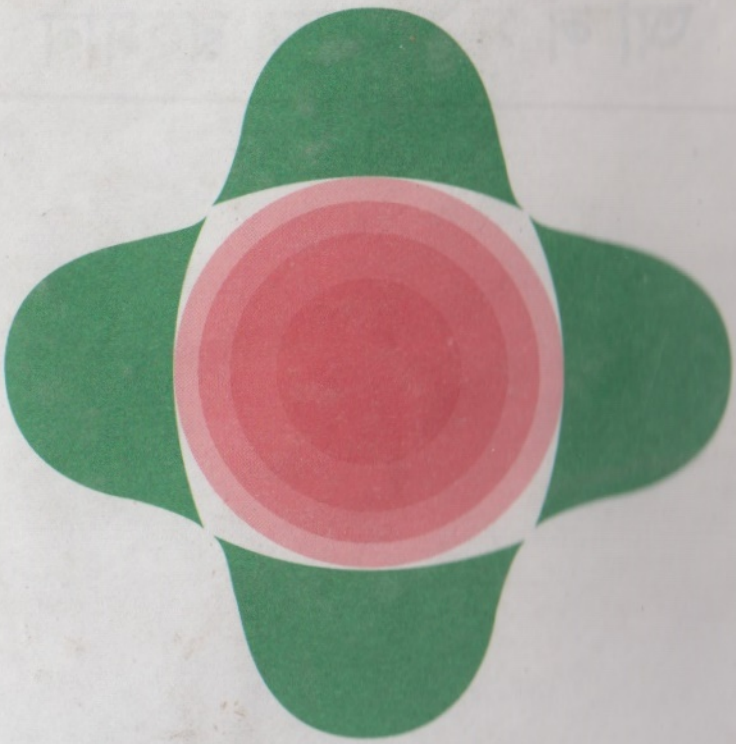
www.pathagar.com